প্রথম অধ্যায়

ভৌত রাশি এবং তাদের পরিমাপ

(Physical Quantities And Their Measurement)

অত্যন্ত নিখুঁতভাবে সময় মাপার জন্য তৈরি অ্যাটমিক ক্লক

বিজ্ঞান বলতেই হয়তো তোমাদের চোখে বিজ্ঞানের নানা যন্ত্রপাতি, আবিষ্কার, গবেষণা, ল্যাবরেটরি— এসবের দৃশ্য ফুটে ওঠে। বিজ্ঞানের আসল বিষয় কিন্তু যন্ত্রপাতি, গবেষণা বা ল্যাবরেটরি নয়, বিজ্ঞানের আসল বিষয় হচ্ছে তার দৃষ্টিভঙ্গি। এই সভ্যতার সবচেয়ে বড়ো অবদান রেখেছে বিজ্ঞান আর সেটি এসেছে পৃথিবীর মানুষের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। বিজ্ঞানের রহস্য অনুসন্ধানের জন্য কখনো সেটি যুক্তিতর্ক দিয়ে বিশ্লেষণ করা হয়, কখনো ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়, আবার কখনো প্রকৃতিতে এই প্রক্রিয়াটিকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পর্যবেক্ষণ করা হয়। সেই প্রাচীনকাল থেকে শুরু করে এখন পর্যন্ত অসংখ্য বিজ্ঞানী মিলে বিজ্ঞানকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। এই অধ্যায়ে পদার্থবিজ্ঞানের এই ক্রমবিকাশের একটি ধারাবাহিক বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।

পদার্থবিজ্ঞানের ইতিহাস পড়লেই আমরা দেখব, এটি তাত্ত্বিক এবং ব্যবহারিক বিজ্ঞানীদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় গড়ে উঠেছে। ল্যাবরেটরিতে গবেষণা করতে হলেই নানা রাশিকে সূক্ষ্মভাবে পরিমাপ করতে হয়। পরিমাপ করার জন্য কীভাবে এককগুলো গড়ে উঠেছে, সেগুলো কীভাবে পরিমাপ করতে হয় এবং পরিমাপের জন্য কী ধরনের যন্ত্রপাতি ব্যবহার করতে হয় সেগুলোও এই অধ্যায়ে আলোচনা করা হবে।

এ অধ্যায় শেষে আমরা –

- পদার্থবিজ্ঞানের পরিসর ও ক্রমবিকাশ ব্যাখ্যা করতে পারব।
- পদার্থবিজ্ঞান পাঠের উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে পারব।
- ভৌত রাশি [মান এবং এককসহ] ও পদার্থবিজ্ঞানের মূল ভিত্তি ব্যাখ্যা করতে পারব।
- পরিমাপ ও এককের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- মৌলিক রাশি ও লব্ধ রাশির পার্থক্য ব্যাখ্যা করতে পারব।
- পরিমাপের আন্তর্জাতিক একক ব্যাখ্যা করতে পারব।
- রাশির মাত্রা হিসাব করতে পারব।
- এককের উপসর্গের গুণিতক ও উপগুণিতকের রূপান্তরের হিসাব করতে পারব। বৈজ্ঞানিক পরিভাষা, প্রতীক ও চিহ্ন ব্যবহার করে পদার্থবিজ্ঞানের ধারণা এবং তত্ত্বকে প্রকাশ করতে পারব।
- যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে ভৌত রাশি পরিমাপ করতে পারব।
- পরিমাপে যথার্থতা, নির্ভুলতা বজায় রাখার কৌশল ব্যাখ্যা করতে পারব।
- সরল যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে সুষম আকৃতির বস্তুর ক্ষেত্রফল ও আয়তন নির্ণয় করতে পারব।
- দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত সুষম আকৃতির বস্তুসামগ্রীর দৈর্ঘ্য, ভর, ক্ষেত্রফল ও আয়তন নির্ণয় করতে পারব।

১.১ পদার্থবিজ্ঞান (Physics)

পদার্থবিজ্ঞান বিজ্ঞানের একটা শাখা এবং বলা যেতে পারে এটা হচ্ছে প্রাচীনতম শাখা। কারণ বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখাগুলো দানা বাঁধার অনেক আগেই বিজ্ঞানীরা পদার্থবিজ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ শাখা-জ্যোতির্বিদ্যা চর্চা শুরু করেছিলেন। পদার্থবিজ্ঞানকে একদিকে যেমন প্রাচীনতম শাখা, ঠিক সেভাবে বলা যেতে পারে এটা সবচেয়ে মৌলিক (Fundamental) শাখা। এর ওপর ভিত্তি করে রসায়ন দাঁড়িয়েছে, রসায়নের ওপর ভিত্তি করে জীববিজ্ঞান দাঁড়িয়েছে, আবার জীববিজ্ঞানের ওপর ভিত্তি করে অন্য অনেক বিষয় দাঁড়িয়ে আছে।

সাধারণভাবে আমরা বলতে পারি, বিজ্ঞানের যে শাখা পদার্থ আর শক্তি এবং এ দুইয়ের মাঝে যে মিথস্ক্রিয়া (Interaction) তাকে বোঝার চেষ্টা করে সেটা হচ্ছে পদার্থবিজ্ঞান। তোমরা নিশ্চয়ই অনুমান করতে পেরেছ এখানে পদার্থ বলতে শুধু আমাদের চারপাশের দৃশ্যমান পদার্থ নয়, পদার্থ যা দিয়ে গঠিত হয়েছে, অর্থাৎ অণু-পরমাণু থেকে শুরু করে ইলেকট্রন, প্রোটন, নিউট্রন, কোয়ার্ক বা স্ট্রিং পর্যন্ত হতে পারে। আবার শক্তি বলতে আমাদের পরিচিত স্থিতিশক্তি, গতিশক্তি, মাধ্যাকর্ষণ বা বিদ্যুৎ চৌম্বকীয় শক্তি ছাড়াও সবল কিংবা দুর্বল নিউক্লিয়ার শক্তিও হতে পারে!

১.২ পদার্থবিজ্ঞানের পরিসর (Scope of Physics)

পদার্থবিজ্ঞান যেহেতু বিজ্ঞানের প্রাচীনতম শাখা এবং সবচেয়ে মৌলিক শাখা, শুধু তা-ই নয়, বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখা কোনো না কোনোভাবে এই শাখাকে ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। তাই খুব স্বাভাবিকভাবেই পদার্থবিজ্ঞানের পরিসর অনেক বড়ো। শুধু তা-ই নয়, পদার্থবিজ্ঞানের নানা সূত্রকে ব্যবহার করে নানা ধরনের প্রযুক্তি গড়ে উঠেছে, সেগুলো আমাদের দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহার করি। বর্তমান সভ্যতার পেছনে সবচেয়ে বড় অবদান হচ্ছে ইলেকট্রনিকসের এবং এই প্রযুক্তিটি গড়ে ওঠার পেছনেও সবচেয়ে বড় অবদান পদার্থবিজ্ঞানের। দৈনন্দিন জীবনযাত্রা ছাড়াও যুদ্ধের তাণ্ডবলীলা থেকে শুরু করে মহাকাশ অভিযান—এরকম প্রতিটি ক্ষেত্রেই পদার্থবিজ্ঞানের ব্যবহার রয়েছে। শুধু তাই নয়, জ্ঞান-বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখা এবং পদার্থবিজ্ঞানকে একত্র করে নিয়মিতভাবে নতুন নতুন শাখা গড়ে উঠেছে; যেমন: Astronomy ও পদার্থবিজ্ঞান মিলে Astrophysics তৈরি হয়েছে, জৈব প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করার জন্য জীববিজ্ঞান এবং পদার্থবিজ্ঞান ব্যবহার করে গড়ে উঠেছে Biophysics, রসায়ন শাখার সাথে পদার্থবিজ্ঞান শাখার সম্মিলনে জন্ম নিয়েছে Chemical Physics, ভূ-তত্ত্বে ব্যবহার করার জন্য

পদার্থবিজ্ঞান ব্যবহার করে তৈরি হয়েছে Geophysics এবং চিকিৎসাবিজ্ঞানে পদার্থবিজ্ঞান ব্যবহার করে গড়ে উঠেছে Medical Physics ইত্যাদি। কাজেই পদার্থবিজ্ঞানের পরিসর সুবিশাল এবং অনেক গভীর। পঠন-পাঠনের সুবিধার জন্য আমরা পদার্থবিজ্ঞানকে দুটি মূল অংশে ভাগ করতে পারি। সেগুলো হচ্ছে:

চিরায়ত পদার্থবিজ্ঞান: এর মাঝে রয়েছে বলবিজ্ঞান, শব্দবিজ্ঞান, তাপ এবং তাপগতি বিজ্ঞান, বিদ্যুৎ ও চৌম্বক বিজ্ঞান এবং আলোক বিজ্ঞান।

আধুনিক পদার্থবিজ্ঞান: কোয়ান্টাম বলবিজ্ঞান এবং আপেক্ষিক তত্ত্ব ব্যবহার করে যে আধুনিক পদার্থবিজ্ঞান গড়ে উঠেছে, সেগুলো হচ্ছে আণবিক ও পারমাণবিক পদার্থবিজ্ঞান, নিউক্লীয় পদার্থবিজ্ঞান, কঠিন অবস্থার পদার্থবিজ্ঞান এবং কণা পদার্থবিজ্ঞান।

আমরা আগেই বলেছি, পদার্থবিজ্ঞান কিংবা বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখাকে ব্যবহার করে পৃথিবীতে নানা ধরনের প্রযুক্তি গড়ে উঠেছে। এই প্রযুক্তি ব্যবহার করে আমরা আমাদের জীবনকে সহজ এবং অর্থপূর্ণ করে তুলেছি, আবার কখনো কখনো ভয়ংকর কিছু প্রযুক্তি বের করে শুধু নিজের জীবন নয়, পৃথিবীর অস্তিত্বও বিপন্ন করে তুলেছি। অনেক সময় অকারণে অপ্রয়োজনীয় প্রযুক্তি গড়ে তুলে পৃথিবীর সম্পদ নষ্ট করার সাথে সাথে আমাদের পরিবেশকে দূষিত করে ফেলছি। কাজেই মনে রেখো, প্রযুক্তি মানেই কিন্তু ভালো নয়, পৃথিবীতে ভালো প্রযুক্তি যেরকম আছে, ঠিক সেরকম খারাপ প্রযুক্তিও আছে। কোনটি ভালো এবং কোনটি খারাপ প্রযুক্তি সেটা কিন্তু তোমাদের নিজেদের বিচারবুদ্ধি ব্যবহার করে বুঝতে হবে।

পদার্থবিজ্ঞান এক দিনে গড়ে ওঠেনি, শত শত বছরে গড়ে উঠেছে। পদার্থবিজ্ঞানীরা তাঁদের চারপাশের রহস্যময় জগৎকে দেখে প্রথমে কোনো একটা সূত্র দিয়ে সেটা ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন। পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে সেই সূত্রকে কখনো গ্রহণ করা হয়েছে, কখনো পরিবর্তন করা হয়েছে, আবার কখনো পরিত্যাগ করা হয়েছে। এভাবে আমরা পদার্থের ক্ষুদ্রতম কণা থেকে শুরু করে মহাবিশ্বের বৃহত্তম আকার পর্যন্ত ব্যাখ্যা করতে শিখেছি। এই শেখাটা হয়তো এখনো পূর্ণাঙ্গ নয়—বিজ্ঞানীরা সেটাকে পূর্ণাঙ্গ করার চেষ্টা করে যাচ্ছেন, যেন কোনো একদিন অত্যন্ত অল্প কিছু সূত্র দিয়ে আপাতদৃষ্টিতে ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের সবকিছু ব্যাখ্যা করা সম্ভব হয়ে যাবে।

নিজে করো

প্রযুক্তি ভালো কিংবা খারাপ হতে পারে; কিন্তু জ্ঞান কখনো খারাপ হতে পারে না, পদার্থবিজ্ঞানের আবিষ্কারের আলোকে এর সপক্ষে যুক্তি দাও।

দলীয় কাজ

পদার্থবিজ্ঞানের সূত্র ব্যবহার করে ভালো প্রযুক্তি এবং খারাপ প্রযুক্তি গড়ে উঠেছে, সেটি নিয়ে একটি বিতর্কের আয়োজন করো।

১.৩ পদার্থবিজ্ঞানের ক্রমবিকাশ (Development of Physics)

আধুনিক সভ্যতা হচ্ছে বিজ্ঞানের অবদান। বিজ্ঞানের এই অগ্রগতি এক দিনে হয়নি, হাজার হাজার বছর থেকে অসংখ্য বিজ্ঞানী এবং গবেষকের অক্লান্ত পরিশ্রমে একটু একটু করে আধুনিক বিজ্ঞান বর্তমান অবস্থায় পৌঁছেছে। মনে রাখতে হবে প্রাচীনকালে তথ্যের আদান-প্রদান এত সহজ ছিল না, বিজ্ঞানের গবেষণার ফলাফল একে অন্যকে জানাতে যথেষ্ট বেগ পেতে হতো, হাতে লিখে বই প্রস্তুত করতে হতো এবং সেই বইয়ের সংখ্যাও ছিল খুব কম। প্রচলিত বিশ্বাসের বিরুদ্ধে কথা বলতে সাহসের প্রয়োজন ছিল। বিজ্ঞানীদের বন্দি করে রাখা বা পুড়িয়ে মারার উদাহরণও রয়েছে। তারপরেও জ্ঞানের অন্বেষণ থেমে থাকেনি এবং বিজ্ঞানীরা প্রকৃতির রহস্য উন্মোচন করে আমাদের এই আধুনিক বিজ্ঞান উপহার দিয়েছেন।

পদার্থবিজ্ঞানের ইতিহাসকে আমরা কয়েকটি পর্বে ভাগ করে বর্ণনা করতে পারি।

১.৩.১ আদি পর্ব (গ্রিক, ভারতবর্ষ, চীন এবং মুসলিম সভ্যতার অবদান)

বর্তমানে পদার্থবিজ্ঞান বলতে আমরা যে বিষয়টিকে বোঝাই, প্রাচীনকালে সেটি শুরু হয়েছিল জ্যোতির্বিদ্যা, আলোকবিজ্ঞান, গতিবিদ্যা এবং গণিতের গুরুত্বপূর্ণ শাখা জ্যামিতির সমন্বয়ে। গ্রিক বিজ্ঞানী থেলিসের (624 BC) নাম আলাদাভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে, কারণ তিনিই প্রথম কার্যকারণ এবং যুক্তি ছাড়া শুধু ধর্ম, অতীন্দ্রিয় এবং পৌরাণিক কাহিনিভিত্তিক ব্যাখ্যা গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছিলেন। থেলিস সূর্যগ্রহণের ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন এবং লোডস্টোনের চৌম্বক ধর্ম সম্পর্কে জানতেন। সেই সময়ের গণিতবিদ ও বিজ্ঞানীদের মাঝে পিথাগোরাস (527 BC) একটি স্মরণীয় নাম। জ্যামিতি এবং কম্পমান তারের ওপর তার মৌলিক কাজ ছিল। গ্রিক দার্শনিক ডেমোক্রিটাস (460 BC) প্রথম ধারণা দেন যে পদার্থের অবিভাজ্য একক আছে, যার নাম দেওয়া হয়েছিল অ্যাটম (এই নামটি আধুনিক পদার্থবিজ্ঞান ব্যবহার করে থাকে)। তবে বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় তার ধারণাটি প্রমাণের কোনো সুযোগ ছিল না বলে সেটি সবার কাছে গ্রহণযোগ্য ছিল না। সেই সময়কার সবচেয়ে বড় দার্শনিক এবং বিজ্ঞানী অ্যারিস্টটলের মাটি, পানি, বাতাস ও আগুন দিয়ে সবকিছু তৈরি হওয়ার মতবাদটিই অনেক বেশি গ্রহণযোগ্য ছিল। আরিস্তারাকস (310 BC) প্রথমে সূর্যকেন্দ্রিক সৌরজগতের ধারণা দিয়েছিলেন এবং

তার অনুসারী সেলেউকাস যুক্তিতর্ক দিয়ে সেটি প্রমাণ করেছিলেন, যদিও সেই যুক্তিগুলো এখন কালের গর্ভে হারিয়ে গেছে। গ্রিক বিজ্ঞান এবং গণিত তার সর্বোচ্চ শিখরে উঠেছিল সর্বকালের একজন শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী আর্কিমিডিসের (287 BC) সময় (চিত্র ১.০১) । তরল পদার্থে ঊর্ধ্বমুখী বলের বিষয়টি এখনো বিজ্ঞান বইয়ের পঠনসূচিতে থাকে। গোলীয় আয়নায় সূর্যরশ্মিকে কেন্দ্রীভূত করে দূর থেকে শত্রুর যুদ্ধজাহাজে আগুন ধরিয়ে তিনি যুদ্ধে সহায়তা করেছিলেন। গ্রিক আমলের আরেকজন বিজ্ঞানী ছিলেন ইরাতোস্থিনিস (276 BC), যিনি সেই সময়ে সঠিকভাবে পৃথিবীর ব্যাসার্ধ বের করেছিলেন।

চিত্র ১.০১: আর্কিমিডিস এবং আল খোয়ারিজমি

এরপর প্রায় দেড় হাজার বছর জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা প্রায় বন্ধ হয়েছিল। শুধু ভারতীয়, মুসলিম এবং চীনা ধারার সভ্যতা গ্রিক ধারার এই জ্ঞানচর্চাকে বাঁচিয়ে রেখেছিল। ভারতবর্ষে আর্যভট্ট (476), ব্রহ্মগুপ্ত এবং ভাস্কর গণিত ও জ্যোতির্বিদ্যার অনেক মূল্যবান কাজ করেছেন। শূন্যকে সত্যিকার অর্থে ব্যবহার করার কাজটিও ভারতবর্ষে (আর্যভট্ট) করা হয়েছিল। মুসলিম গণিতবিদ এবং বিজ্ঞানীদের ভেতর আল খোয়ারিজমির (783) নাম আলাদাভাবে উল্লেখ করতে হয় (চিত্র ১.০১)। তার লেখা 'আল জাবির' বই থেকে বর্তমান অ্যালজেবরা নামটি এসেছে। ইবনে আল হাইয়াম (965) কে আলোকবিজ্ঞানের স্থপতি হিসেবে বিবেচনা করা হয়। আল মাসুদি (896) প্রকৃতির ইতিহাস নিয়ে 30 খণ্ডে একটি এনসাইক্লোপিডিয়া লিখেছিলেন। ওমর খৈয়ামের নাম সবাই কবি হিসেবে জানে; কিন্তু তিনি ছিলেন উঁচুমাপের একজন গণিতবিদ, জ্যোতির্বিদ এবং দার্শনিক। চীনা গণিতবিদ ও বিজ্ঞানীরাও পদার্থবিজ্ঞান নিয়ে অনেক কাজ করেছেন। তাঁদের মাঝে শেন কুয়োর নামটি উল্লেখ করা যায় (1031), যিনি চুম্বক নিয়ে কাজ করেছেন এবং ভ্রমণের সময় কম্পাস ব্যবহার করে দিক নির্ধারণ করার বিষয়টি উল্লেখ করেছিলেন।

১.৩.২ বিজ্ঞানের উত্থানপর্ব

ষোড়শ এবং সপ্তদশ শতাব্দীতে ইউরোপে পদার্থবিজ্ঞানের জগতে একটি বিস্ময়কর বিপ্লবের শুরু হয়, সময়টা ছিল ইউরোপীয় রেঁনেসার যুগ। 1543 সালে কপার্নিকাস (চিত্র ১.০২) তার একটি বইয়ে সূর্যকেন্দ্রিক একটি সৌরজগতের ব্যাখ্যা দেন (বইয়ের প্রকাশক ধর্মযাজকদের ভয়ে লিখেছিলেন যে এটি সত্যিকারের ব্যাখ্যা নয়, শুধু একটি গাণিতিক সমাধান মাত্র!)। কপার্নিকাসের তত্ত্বটি দীর্ঘদিন লোকচক্ষুর আড়ালে পড়ে ছিল, গ্যালিলিও (1564-1642) সেটিকে সবার সামনে নিয়ে আসেন। তিনি গাণিতিক সূত্র দেওয়ার পর পরীক্ষা করে সেই সূত্রটি প্রমাণ করার বৈজ্ঞানিক ধারার সূচনা করেন। গ্যালিলিওকে (চিত্র ১.০২) অনেক সময় আধুনিক বিজ্ঞানের জনক বলা হয়। তবে সূর্যকেন্দ্রিক সৌরজগতের প্রবক্তা হওয়ার কারণে তিনি চার্চের কোপানলে পড়েছিলেন এবং শেষ জীবনে তাঁকে গৃহবন্দি হয়ে কাটাতে হয়। 1687 খ্রিষ্টাব্দে বিজ্ঞানী নিউটন (চিত্র ১.০২) বলবিদ্যার তিনটি এবং মহাকর্ষ বলের সূত্র প্রকাশ করেন, যেটি বল এবং গতিবিদ্যার ভিত্তি তৈরি করে দেয়। আলোকবিজ্ঞান এবং অন্য আরও কাজের সাথে সাথে বিজ্ঞানী নিউটন লিবনিজের সাথে গণিতের নতুন একটি শাখা 'ক্যালকুলাস' আবিষ্কার করেছিলেন।

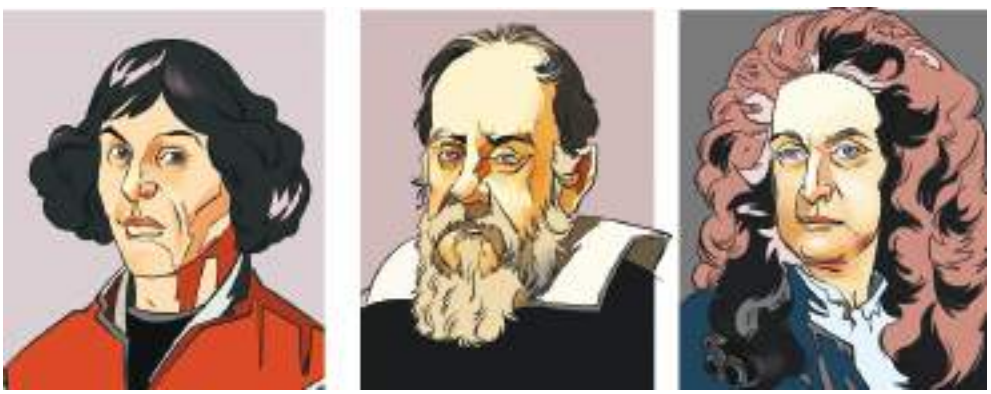

চিত্র ১.০২: কপার্নিকাস, গ্যালিলিও এবং নিউটন

অষ্টাদশ শতাব্দীর আগে তাপকে ভরহীন একধরনের তরল হিসেবে বিবেচনা করা হতো। 1798 সালে কাউন্ট রামফোর্ড দেখান, তাপ একধরনের শক্তি এবং যান্ত্রিক শক্তিকে তাপশক্তিতে রূপান্তর করা যায়। আরও অনেক বিজ্ঞানীর গবেষণার ওপর ভিত্তি করে লর্ড কেলভিন 1850 সালে তাপ গতিবিজ্ঞানের (থার্মোডিনামিক্সের) দুটি গুরুত্বপূর্ণ সূত্র দিয়েছিলেন।

বিদ্যুৎ ও চুম্বকের ওপরেও এই সময় ব্যাপক গবেষণা শুরু হয়। 1778 সালে কুলম্ব বৈদ্যুতিক চার্জের ভেতরকার বলের জন্য সূত্র আবিষ্কার করেন। 1800 সালে ভোল্টা বৈদ্যুতিক ব্যাটারি আবিষ্কার করার পর বিদ্যুৎ নিয়ে নানা ধরনের গবেষণা শুরু হয়। 1820 সালে অরস্টেড দেখান বিদ্যুৎপ্রবাহ দিয়ে চুম্বক তৈরি করা যায়। 1831 সালে ফ্যারাডে এবং হেনরি ঠিক তার বিপরীত প্রক্রিয়াটি আবিষ্কার করেন।

তারা দেখান চৌম্বক ক্ষেত্রের পরিবর্তন করে বিদ্যুৎ তৈরি করা যায়। 1864 সালে ম্যাক্সওয়েল (চিত্র ১.০৩) তাঁর বিখ্যাত ম্যাক্সওয়েল সমীকরণ দিয়ে পরিবর্তনশীল বিদ্যুৎ ও চৌম্বক ক্ষেত্রকে একই সূত্রের মাঝে নিয়ে এসে দেখান যে আলো আসলে একটি বিদ্যুৎ চৌম্বকীয় তরঙ্গ। বিদ্যুৎ ও চুম্বক আলাদা কিছু নয়, আসলে এ দুটি একই শক্তির দুটি ভিন্ন রূপ। এটি সময়োপযোগী একটি আবিষ্কার ছিল। কারণ, 1801 সালে ইয়ং পরীক্ষার মাধ্যমে আলোর তরঙ্গ ধর্মের প্রমাণ করে রেখেছিলেন।

1.3.3 আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানের সূচনা

ঊনবিংশ শতাব্দীর শুরু থেকেই বিজ্ঞানীরা দেখতে লাগলেন প্রচলিত পদার্থবিজ্ঞান দিয়ে অনেক কিছু ব্যাখ্যা করা যাচ্ছে না। 1803 সালে ডাল্টন পারমাণবিক তত্ত্ব দিয়েছেন, 1897 সালে থমসন সেই পরমাণুর ভেতর ইলেকট্রন আবিষ্কার করেছেন, 1911 সালে রাদারফোর্ড (চিত্র ১.০৩) দেখিয়েছেন, পরমাণুর কেন্দ্রে

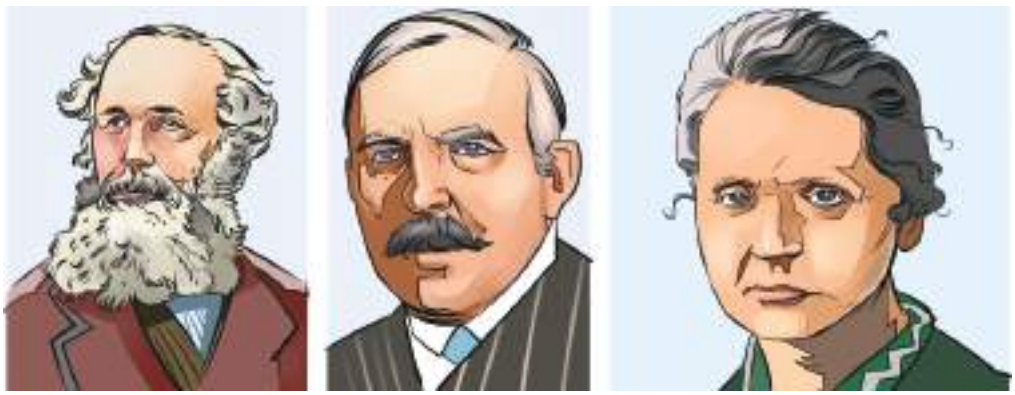

চিত্র ১.০৩: ম্যাক্সওয়েল, রাদারফোর্ড এবং মেরি কুরি

খুবই ক্ষুদ্র নিউক্লিয়াসে পজিটিভ চার্জগুলো থাকে। কিন্তু দেখা গেল নিউক্লিয়াসকে ঘিরে ঘুরন্ত ইলেকট্রনের মডেলটি কোনোভাবে ব্যাখ্যা করা যায় না, কারণ বিদ্যুৎ চৌম্বকীয় সূত্র অনুযায়ী এই অবস্থায় ইলেকট্রন তার শক্তি বিকিরণ করে নিউক্লিয়াসের ভেতর পড়ে যাবে; কিন্তু বাস্তবে তা কখনো ঘটে না। 1900 সালে ম্যাক্স প্ল্যাংক কোয়ান্টাম তত্ত্ব আবিষ্কার করেন, যা ব্যবহার করে কৃষ্ণবস্তুর বিকিরণ ব্যাখ্যা করা সম্ভব হয়। পরবর্তী সময়ে বিজ্ঞানী বোর পরমাণুর স্থিতিশীলতা ব্যাখ্যা করার জন্য কোয়ান্টাম তত্ত্ব ব্যবহার করেন। বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসু 1924 সালে কোয়ান্টাম তত্ত্বের ধারণা ব্যবহার করে বিকিরণ সংক্রান্ত কোয়ান্টাম সংখ্যায়নতত্ত্ব প্রদান করেন। এজন্য বিজ্ঞানী বসুকে কোয়ান্টাম সংখ্যায়নতত্ত্বের জনক হিসেবে অভিহিত করা হয়, এবং তাঁর অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ একশ্রেণির মৌলিক কণাকে বোজন (Boson) নাম দেওয়া হয়। 1900 থেকে 1930 সাল পর্যন্ত এই সময়টিতে হাইজেনবার্গ, শ্রোডিঙ্গার, ডিরাকসহ অনেক বড় বড় বিজ্ঞানী মিলে পদার্থের কোয়ান্টাম তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত করেন।

বিদ্যুৎ চৌম্বকীয় তরঙ্গের বাহক হিসেবে ইথার নামে একটি বিষয় কল্পনা করে নেওয়া হয়েছিল এবং 1887 সালে মাইকেলসন ও মোরলি তার অস্তিত্ব আবিষ্কার করার চেষ্টা করে দেখান যে প্রকৃতপক্ষে ইথার বলে কিছু নেই এবং আলোর বেগ স্থির কিংবা গতিশীল সব মাধ্যমে সমান! 1905 সালে

আইনস্টাইনের (চিত্র ১.০৪) 'থিওরি অব রিলেটিভিটি' থেকে এই বিষয়টির ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। থিওরি অব রিলেটিভিটি থেকেই সর্বকালের সবচেয়ে চমকপ্রদ সূত্র $E=mc^2$ বের হয়ে আসে, যেখানে দেখানো হয় বস্তুর ভরকে শক্তিতে রূপান্তর করা সম্ভব।

চিত্র ১.০৪ : আলবার্ট আইনস্টাইন এবং সত্যেন্দ্রনাথ বসু

কোয়ান্টাম তত্ত্বের সাথে থিওরি অব রিলেটিভিটি ব্যবহার করে ডিরাক 1931 সালে প্রতি কণা (Anti Particle) অস্তিত্ব ঘোষণা করেন, যেটি পরের বছরেই আবিষ্কৃত হয়ে যায়।

1895 সালে রন্টজেন এক্স-রে আবিষ্কার করেন। 1896 সালে বেকেরেল দেখান যে পরমাণুর কেন্দ্র থেকে তেজস্ক্রিয় বিকিরণ হচ্ছে। 1899 সালে পিয়ারে ও মেরি কুরি (চিত্র ১.০৩) রেডিয়াম আবিষ্কার করেন এবং বিজ্ঞানীরা বুঝতে পারেন পরমাণুগুলো আসলে অবিনশ্বর নয়, সেগুলো ভেঙে তেজস্ক্রিয় বিকিরণ হতে পারে।

১.৩.৪ সাম্প্রতিক পদার্থবিজ্ঞান

ইলেকট্রনিকস এবং আধুনিক প্রযুক্তির আবিষ্কারের কারণে শক্তিশালী এক্সেলারেটর (Acceleretor) তৈরি করা সম্ভব হয় এবং অনেক বেশি শক্তিতে ত্বরিত করে নতুন নতুন কণা আবিষ্কৃত হতে থাকে। তাত্ত্বিক Standard Model ব্যবহার করে এই কণাগুলোকে চমৎকারভাবে সুবিন্যস্ত করা সম্ভব হয়। আপাতদৃষ্টিতে অসংখ্য নতুন নতুন কণা মনে হলেও অল্প কয়েকটি মৌলিক কণা (এবং তাদের প্রতি কণা) দিয়ে সকল কণার গঠন ব্যাখ্যা করা সম্ভব হয়। Standard Model ব্যবহার করে এই কণাগুলোর ভর ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয় বলে ভরের জন্য হিগস বোজন (Higg's boson) নামে একটি নতুন কণার অস্তিত্ব ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়। 2013 সালে পরীক্ষাগারে হিগস বোজনকে শনাক্ত করার এই ঘটনাটিকে তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞানের বিরাট সাফল্য হিসেবে ধরা হয়।

1924 সালে হাবল দেখিয়েছিলেন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সবগুলো গ্যালাক্সি একে অন্য থেকে দূরে সরে যাচ্ছে, যেটি প্রদর্শন করে যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ধীরে ধীরে প্রসারিত হচ্ছে। যার অর্থ, অতীতে একসময় পুরো বিশ্বব্রহ্মাণ্ড এক জায়গায় ছিল। বিজ্ঞানীরা দেখান প্রায় 14 বিলিয়ন বছর আগে 'বিগ ব্যাং' নামে একটি প্রচণ্ড বিস্ফোরণে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তৈরি হওয়ার পর থেকে সেটি প্রসারিত হতে থাকে। অতি সম্প্রতি বিজ্ঞানীরা দেখিয়েছেন, এই প্রসারণ কখনোই থেমে যাবে না এবং বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সবকিছুই একটি অন্যটি থেকে দূরে সরে যাবে। পদার্থবিজ্ঞানীরা আরও দেখিয়েছেন, তাঁরা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের দৃশ্যমান গ্রহ-নক্ষত্র গ্যালাক্সির মাত্র 4 শতাংশ ব্যাখ্যা করতে পারেন, বাকি ব্যাখ্যা করতে হলে রহস্যময় ডার্ক ম্যাটার ও ডার্ক এনার্জির ধারণা মেনে নিতে হয়। যার গঠন নিয়ে বিজ্ঞানীরা গবেষণা করে যাচ্ছেন।

কঠিন পদার্থের বিজ্ঞান (Solid State Physics) নিয়ে গবেষণা অর্ধপরিবাহী পদার্থের জন্ম দেয়, যেগুলো ব্যবহার করে বর্তমান ইলেকট্রনিকস গড়ে উঠেছে, যেটি বর্তমান সভ্যতার ভিত্তিমূল।

নিজে করো

"বিংশ শতাব্দীতে পদার্থবিজ্ঞানের বিস্ময়কর অগ্রগতি ঘটে' –উদাহরণসহ এর পক্ষে যুক্তি দাও।

১.৩.৫ জগদীশচন্দ্র বসুর অবদান (Contributions of Jagadish Chandra Bose)

আচার্য স্যার জগদীশচন্দ্র বসু (চিত্র ১.০৫) একদিকে ছিলেন একজন প্রখ্যাত পদার্থবিজ্ঞানী; অন্যদিকে একজন সফল জীববিজ্ঞানী। আমাদের এই উপমহাদেশে তিনি ছিলেন প্রথম আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পাওয়া একজন বিজ্ঞানী। জগদীশচন্দ্র বসুর পূর্বপুরুষেরা থাকতেন ঢাকা জেলার বিক্রমপুরের রাঢ়িখাল গ্রামে। তার জন্ম হয় 1858 সালের 30 নভেম্বর, ময়মনসিংহে। তাঁর বাবা ভগবানচন্দ্র বসু ফরিদপুর জেলার একজন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। তার লেখাপড়া শুরু হয় ফরিদপুরের গ্রামীণ বিদ্যালয়ে, পরে কলকাতায় হেয়ার স্কুল এবং সেন্ট জেভিয়ার স্কুল ও কলেজে পড়াশোনা শেষ করেন। 1880 সালে বিএ পাস করার পর তিনি ইংল্যান্ড যান এবং 1880-1884 সালের ভেতরে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিজ্ঞানে অনার্সসহ বিএ এবং লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিএসসি ডিগ্রি অর্জন করেন। 1885 সালে মাতৃভূমিতে ফিরে এসে প্রেসিডেন্সি কলেজে পদার্থবিজ্ঞান বিষয়ে অধ্যাপনা শুরু করেন। সেই যুগে কলেজে গবেষণার তেমন কোনো সুযোগ ছিল না। তার পরও তিনি গবেষণার

কাজ চালিয়ে যান। দিনের বেলায় তাঁর নানারকম ব্যস্ততা ছিল। তাই গবেষণার কাজ করতেন রাতের বেলায়।

চিত্র ১.০৫ : আচার্য স্যার জগদীশচন্দ্র বসু।

বৈদ্যুতিক তার ছাড়া কীভাবে দূরে রেডিও সংকেত পাঠানো যায় এ বিষয়ে তিনি অনেক গবেষণা করেন। 1895 সালে তিনি প্রথমবারের মতো বেতারে দূরবর্তী স্থানে রেডিও সংকেত পাঠিয়ে দেখান। মাইক্রোওয়েভ গবেষণার ক্ষেত্রেও তাঁর বড় অবদান আছে, তিনিই প্রথম বিদ্যুৎ চৌম্বকীয় বিকিরণের তরঙ্গদৈর্ঘ্যকে মিলিমিটার পর্যায়ে (প্রায় 5 মিলিমিটার) নামিয়ে আনতে সক্ষম হন। আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রেডিও সংকেতকে শনাক্ত করার জন্য অর্ধপরিবাহী জংশন ব্যবহার করেন। এই আবিষ্কার পেটেন্ট করে বাণিজ্যিক সুবিধা নেওয়ার পরিবর্তে তিনি সেটি সবার জন্য উন্মুক্ত করে দেন। পৃথিবীর সবচেয়ে বড় কারিগরি, প্রযুক্তিবিদ এবং পেশাজীবীদের প্রতিষ্ঠান ইনস্টিটিউট অব ইলেকট্রিক্যাল এন্ড ইলেকট্রনিকস ইঞ্জিনিয়ারিং (IEEE) তাঁকে রেডিও বিজ্ঞানের একজন জনক হিসেবে অভিহিত করেছে।

পরবর্তী সময়ে জগদীশচন্দ্র বসু উদ্ভিদ শারীরতত্ত্বের ওপর অনেক গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার করেন। এর মাঝে উদ্ভিদের বৃদ্ধি রেকর্ড করার জন্য ক্রেস্কোগ্রাফ আবিষ্কার, খুব সূক্ষ্ম নড়াচড়া শনাক্ত এবং বিভিন্ন উদ্দীপকে সাড়া দেওয়ার বিষয়গুলো উল্লেখযোগ্য। আগে ধারণা করা হতো উদ্দীপকের সাড়া দেওয়ার প্রকৃতি হচ্ছে রাসায়নিক, তিনি দেখিয়েছিলেন এটি আসলে বৈদ্যুতিক।

1917 সালে উদ্ভিদ শারীরতত্ত্ব নিয়ে গবেষণা করার জন্য তিনি কলকাতায় বসু বিজ্ঞান মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। জগদীশচন্দ্র বসু বাংলায় লেখা রচনাবলি 'অব্যক্ত' নামক গ্রন্থে সংকলিত করেছেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য একটি গ্রন্থ হচ্ছে "Response in the living and nonliving".

1937 সালের 23 নভেম্বর জ্ঞানতাপস আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু মৃত্যুবরণ করেন।

১.৪ পদার্থবিজ্ঞানের উদ্দেশ্য (Objectives of Physics)

তোমরা এর মাঝে জেনে গেছ যে পদার্থবিজ্ঞান হচ্ছে বিজ্ঞানের সেই শাখা, যেটি শক্তি এবং বলের উপস্থিতিতে সময়ের সাথে বস্তুর অবস্থান পরিবর্তন ব্যাখ্যা করে। যেকোনো জ্ঞানের মতোই পদার্থবিজ্ঞানের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে জানা, পদার্থবিজ্ঞানের জানার পরিসরটি অনেক বড়ো, ক্ষুদ্র পরমাণু থেকে বিশাল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের রহস্য উদ্ঘাটন করাই হচ্ছে পদার্থবিজ্ঞানের উদ্দেশ্য। বোঝার সুবিধার জন্য আমরা পদার্থবিজ্ঞানের উদ্দেশ্যকে তিনটি মূল ভাগে ভাগ করতে পারি:

১.৪.১ প্রকৃতির রহস্য উদঘাটন

প্রাচীনকালে চীন দেশে একটুকরো লোড স্টোনকে সমজাতীয় অন্য একটি লোড স্টোনের টুকরোকে অদৃশ্য একটা শক্তি দিয়ে আকর্ষণ করতে দেখা গিয়েছিল। বিশেষ ধরনের এই পদার্থের বিশেষ এই ধর্মটির নাম দেওয়া হয়েছিল চৌম্বকত্ব (Magnetism) । একইভাবে প্রাচীন গ্রিসে আম্বর নামের পদার্থকে পশম দিয়ে ঘষা হলে সেটি এই দুটি পদার্থকে একটি অদৃশ্য শক্তি দিয়ে আকর্ষণ করত। এই বিশেষ ধর্মের নাম দেওয়া হলো ইলেকট্রিসিটি বা বৈদ্যুতিক শক্তি (Electricity)। অষ্টাদশ শতাব্দীতে এটি নিয়ে ব্যাপক গবেষণা হয় এবং বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেন এটি একই বলের দুটি ভিন্ন রূপ এবং এই বলটির নাম দেওয়া হয় বিদ্যুৎ চৌম্বকীয় বল (Electromagnetism)। পরবর্তীতে তেজস্ক্রিয়তা আবিষ্কৃত হওয়ার পর বিটা রশ্মি নামে একটা বিশেষ বিকিরণ ব্যাখ্যা করার সময় 'দুর্বল নিউক্লিয় বল' নামে নতুন এক ধরনের বল আবিষ্কৃত হয়। পদার্থবিজ্ঞানীরা পরে দেখালেন বিদ্যুৎ চৌম্বকীয় বল এবং দুর্বল নিউক্লিয় বল একই বলের ভিন্ন ভিন্ন রূপ। তাদেরকে একত্র করে সেই বলের নাম দেওয়া হলো ইলেকট্রো উইক ফোর্স। পদার্থবিজ্ঞানীরা ধারণা করেন, প্রকৃতিতে মহাকর্ষ বল এবং নিউক্লিয়ার বল নামে আরও যে দুটি বল রয়েছে ভবিষ্যতে সেগুলোও একই সূত্রের আওতায় আনা যাবে।

পদার্থবিজ্ঞান এভাবেই একের পর এক প্রকৃতির রহস্য উন্মোচন করে যাচ্ছে। একইভাবে বলা যায় একটি বস্তু তৈরি হয়েছে অণু দিয়ে, পরবর্তীতে দেখা গেছে, অণুগুলো মৌলগুলোর পরমাণু দিয়ে তৈরি। পরমাণুগুলোর চার্জ নিরপেক্ষ হলেও তার কেন্দ্রে রয়েছে পজিটিভ চার্জের নিউক্লিয়াস এবং তাকে কেন্দ্র করে ইলেকট্রনগুলো ঘুরছে। ইলেকট্রন একটি মৌলিক কণা হলেও দেখা গেল নিউক্লিয়াস প্রোটন এবং নিউট্রন দিয়ে তৈরি। পরবর্তীতে দেখা যায়, নিউট্রন এবং প্রোটনও কোয়ার্ক নামে অন্য এক ধরনের মৌলিক কণা দিয়ে তৈরি। ইলেকট্রন এবং কোয়ার্ক স্ট্রিং দিয়ে তৈরি কি না সেটি বর্তমান সময়ের গবেষণার বিষয়।

১.৪.২ প্রকৃতির নিয়মগুলো জানা

সৃষ্টির আদিকাল থেকে আমরা জানি যে উপর থেকে কিছু ছেড়ে দিলে সেটি নিচে পড়বে এবং সেটি দেখে আমরা অনুমান করতে পারি যে পৃথিবীর সবকিছুই তার নিজের দিকে আকর্ষণ করছে। পদার্থবিজ্ঞান যদি শুধু মাধ্যাকর্ষণ বলের অস্তিত্বের কথা ঘোষণা করে থেমে যায়, তাহলে সেটি মোটেও যথেষ্ট নয়। একটি নির্দিষ্ট ভরের বস্তুকে অন্য নির্দিষ্ট ভর কতটুকু বল দিয়ে আকর্ষণ করে এবং দূরত্বের সাথে সেটি কীভাবে পরিবর্তিত হয়, সেটি নিখুঁতভাবে না জানা পর্যন্ত এই জ্ঞানটুকু পূর্ণ হয় না। নিউটন মহাকর্ষ বলের সূত্র দিয়ে অত্যন্ত সঠিকভাবে প্রকৃতির এই নিয়মটি ব্যাখ্যা করেছেন। প্রকৃতির নিয়মটি সঠিকভাবে জানা হলে সেটি অন্য অনেক জায়গায় প্রয়োগ করে ব্যবহার করা যায়। কাজেই মহাকর্ষ বলের সূত্র

দিয়ে যেরকম একটি পড়ন্ত বস্তুর গতি ব্যাখ্যা করা যায়, ঠিক সেরকম সূর্যকে ঘিরে পৃথিবীর প্রদক্ষিণকেও ব্যাখ্যা করা যায়। প্রকৃতির এই নিয়মগুলো সঠিকভাবে জানার জন্য বিজ্ঞানীরা সেটি যেরকম যুক্তিতর্ক দিয়ে বিশ্লেষণ করেছেন, ঠিক সেরকম ল্যাবরেটরিতে নানা ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষাও করে যাচ্ছেন। পদার্থবিজ্ঞানের বিস্ময়কর সাফল্যের পেছনে যেরকম তাত্ত্বিক গবেষণা হয়েছে, ঠিক সেরকম রয়েছে পরীক্ষা-নিরীক্ষা। এই দুটি ভিন্ন ধারায় গবেষণা করে প্রকৃতির নিয়মগুলো খুঁজে বের করা পদার্থবিজ্ঞানের মূল উদ্দেশ্য।

১.৪.৩ প্রাকৃতিক নিয়ম ব্যবহার করে প্রযুক্তির বিকাশ

আইনস্টাইন থিওরি অব রিলেটিভিটি থেকে $E = mc^2$ সূত্রটি বের করে দেখিয়েছিলেন ভরকে শক্তিতে রূপান্তর করা যায়। 1938 সালে অটোহান এবং স্ট্রেসম্যান একটি নিউক্লিয়াসকে ভেঙে দেখান যে নিউক্লিয়াসের ভর যেটুকু কমে গিয়েছে, সেটা শক্তি হিসেবে বের হয়েছে। এই সূত্র ব্যবহার করে নিউক্লিয়ার বোমা তৈরি করে সেটি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ হিরোশিমা এবং নাগাসাকিতে ফেলে মুহূর্তের মাঝে লক্ষ লক্ষ মানুষ মেরে ফেলা সম্ভব হয়েছিল। শুধু যে মারণাস্ত্র তৈরি করা সম্ভব তা নয়, এই শক্তি মানুষের কাজেও লাগানো সম্ভব। এই সূত্র ব্যবহার করে নিউক্লিয়ার বৈদ্যুতিক কেন্দ্র (Nuclear Power Plant) তৈরি করা হয় এবং আমাদের রূপপুরেও সেরকম একটি নিউক্লিয়ার বিদ্যুৎ কেন্দ্র তৈরি হতে যাচ্ছে।

পদার্থবিজ্ঞানের একটি শাখা হচ্ছে কঠিন অবস্থার পদার্থবিজ্ঞান এবং সেখানে অর্ধপরিবাহী নিয়ে কাজ করা হয়। এই অর্ধপরিবাহীর সাথে বিশেষ মৌল মিশিয়ে তাদের যুক্ত করে ট্রানজিস্টার তৈরি করা হয়। এই প্রযুক্তি দিয়ে ইলেকট্রনিকসের একটি অভাবনীয় উন্নতি হয়েছে এবং বর্তমান সভ্যতায় এই ইলেকট্রনিকসের একটি অনেক বড় অবদান রয়েছে।

আমরা এভাবে দেখাতে পারব, প্রযুক্তির প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই পদার্থবিজ্ঞানের ছোটো কিংবা বড়ো অবদান রয়েছে।

দলীয় কাজ

পদার্থবিজ্ঞানের ক্রমবিকাশ কীভাবে হয়েছে সেটি নিয়ে একটি পোস্টার তৈরি করো।

আমরা কেন পদার্থবিজ্ঞান পড়ব—এ সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন রচনা করো।

নিজে করো

একটি সরল রেখায় নির্দিষ্ট দূরত্বকে নির্দিষ্ট সময় ধরে প্রাচীনকাল থেকে এখন পর্যন্ত বিভিন্ন বিজ্ঞানী যে গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলো করেছেন, সেগুলো বসিয়ে দেখাও মানবসভ্যতার ইতিহাসে একটি অন্ধকার কাল রয়েছে। কেন এই অন্ধকার কাল ছিল তার কোনো একটি কারণ খুঁজে বের করো।

১.৫ ভৌত রাশি এবং তাদের পরিমাপ (Physical Quantities and Their Measurement)

পানি ঠান্ডা হলে সেটা বরফ হয়ে যায়, গরম করলে সেটা বাষ্প হয়ে যায় – এটা আমরা সবাই জানি। মানুষ প্রাচীনকাল থেকেই এটা দেখে আসছে। এই জ্ঞানটুকু কিন্তু পুরোপুরি বিজ্ঞান হতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা বলতে পারব, কোন অবস্থায় ঠিক কত তাপমাত্রায় পানি জমে বরফ হয় কিংবা সেটা বাড়িয়ে কোন অবস্থায় কত তাপমাত্রায় নিয়ে গেলে সেটা ফুটতে থাকে, বাষ্পে পরিণত হতে শুরু করে। তার অর্থ প্রকৃত বিজ্ঞান করতে হলে সবকিছুর পরিমাপ করতে হয়। বিজ্ঞানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, এই পরিমাপ করে সব কিছুকে নিখুঁতভাবে ব্যাখ্যা করা।

টেবিল ১.০১: SI ইউনিটে সাতটি ভিন্ন ভিন্ন ভৌত রাশি

রাশি	একক	প্রতীক
দৈর্ঘ্য	মিটার (meter)	m
ভর	কিলোগ্রাম (kilogram)	kg
সময়	সেকেন্ড (second)	s
বৈদ্যুতিক প্রবাহ	অ্যাম্পিয়ার (ampere)	A
তাপমাত্রা	কেলভিন (kelvin)	K
পদার্থের পরিমাণ	মোল (mole)	mol
দীপন তীব্রতা	ক্যান্ডেলা (candela)	cd

এই জগতে যা কিছু আমরা পরিমাপ করতে পারি, তাকে আমরা রাশি বলি। এই ভৌতজগতে অসংখ্য বিষয় রয়েছে, যা পরিমাপ করা সম্ভব। উদাহরণ দেওয়ার জন্য বলা যেতে পারে, কোনো কিছুর দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, উচ্চতা, আয়তন, ওজন, তাপমাত্রা, রং, কাঠিন্য, তার অবস্থান, বেগ, তার ভেতরকার উপাদান, বিদ্যুৎ পরিবাহিতা, অপরিবাহিতা, স্থিতিস্থাপকতা, তাপ পরিবাহিতা, অপরিবাহিতা, ঘনত্ব, আপেক্ষিক তাপ, চাপ, গলনাঙ্ক, স্ফুটনাঙ্ক ইত্যাদি, অর্থাৎ আমরা বলে শেষ করতে পারব না। এক কথায় ভৌতজগতে রাশিমালার কোনো শেষ নেই। তোমাদের তাই মনে হতে পারে এই অসংখ্য রাশিমালা পরিমাপ করার জন্য আমাদের বুঝি অসংখ্য রাশির সংজ্ঞা আর অসংখ্য একক তৈরি করে রাখতে হবে! আসলে সেটি সত্যি নয়, তোমরা শুনে খুবই অবাক হবে (এবং নিশ্চয়ই খুশি হবে) যে মাত্র সাতটি রাশির সাতটি একক ঠিক করে নিলে, সেই সাতটি একক ব্যবহার করে আমরা অন্য সব একক বের করে ফেলতে পারব। এই সাতটি রাশিকে বলে মৌলিক রাশি এবং এই মৌলিক রাশি ব্যবহার করে যখন অন্য কোনো

রাশি প্রকাশ করি সেটি হচ্ছে লব্ধ রাশি। মৌলিক রাশিগুলো হচ্ছে দৈর্ঘ্য, ভর, সময়, বৈদ্যুতিক প্রবাহ, তাপমাত্রা, পদার্থের পরিমাণ এবং দীপন তীব্রতা। এই সাতটি মৌলিক রাশির আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত সাতটি একককে বলে SI একক, (SI এসেছে ফরাসি ভাষার Systeme International d'Unites কথাটি থেকে) এবং সেগুলো ১.০১ টেবিলে দেখানো হয়েছে।১.০২ টেবিলে অনেক বড়ো থেকে অনেক ছোটো কিছু দুরত্ব, ভর এবং সময় দেখানো হয়েছে।

টেবিল ১.০২: অনেক বড়ো থেকে অনেক ছোটো দূরত্ব, ভর এবং সময়

দূরত্ব	m	ভর	kg	সময়	s
নিকটতম গ্যালাক্সি	2×10^{22}	আমাদের গ্যালাক্সি	2×10^{41}	বিগ ব্যাংয়ের পর থেকে অতিবাহিত সময়	4×10^{17}
নিকটতম নক্ষত্র	4×10^{16}	সূর্য	2×10^{30}	ডাইনোসরের ধ্বংসের পর থেকে অতিবাহিত সময়	2×10^{14}
সৌরজগতের ব্যাসার্ধ	6×10^{12}	পৃথিবী	6×10^{24}	মানুষের অভ্যুদয়ের পর থেকে অতিবাহিত সময়	8×10^{12}
পৃথিবীর ব্যাসার্ধ	6×10^{6}	জাহাজ	7×10^{7}	এক দিন	9×10^{4}
এভারেস্টের উচ্চতা	9×10^{3}	হাতি	5×10^{3}	মানুষের হৃৎস্পন্দন	1
ভাইরাসের দৈর্ঘ্য	1×10^{-8}	মানুষ	6×10^{1}	মিউওনের আয়ু	2×10^{-6}
হাইড্রোজেন পরমাণুর ব্যাসার্ধ	5×10^{-11}	ধূলিকণা	7×10^{-7}	স্পন্দনকাল: সবুজ আলো	2×10^{-15}
প্রোটনের ব্যাসার্ধ	1×10^{-15}	ইলেকট্রন	9×10^{-31}	স্পন্দনকাল: এক MeV গামা রশ্মি	4×10^{-21}

১.৫.১ পরিমাপের একক (Units of Measurements)

এই এককগুলোর ভেতর সেকেন্ড, মিটার এবং ক্যান্ডেলার পরিমাপ আগেই কয়েকটি ধ্রুব দিয়ে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছিল। 2019 সালের মে মাস থেকে কিলোগ্রাম, কেলভিন, মোল এবং অ্যাম্পিয়ারকেও পদার্থবিজ্ঞানের মৌলিক কিছু ধ্রুব ব্যবহার করে নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। কাজেই এখন পৃথিবীর যেকোনো ল্যাবরেটরিতে এই ধ্রুবগুলো পরিমাপ করে সেখান থেকে সবগুলো এককের পরিমাপ অনেক সূক্ষ্মভাবে পরিমাপ করা সম্ভব হবে। সাতটি একক পরিমাপ করার জন্য যে মৌলিক ধ্রুবগুলোর মান চিরদিনের জন্য নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে সেগুলো ১.০৩ টেবিলে দেখানো হয়েছে। কোন ধ্রুব ব্যবহার করে কোন একক পরিমাপ করা হয় সেটি ১.০৪ টেবিলে দেখানো হয়েছে। এককগুলোর নতুন এবং সহজ সংজ্ঞাগুলো এরকম:

টেবিল 1.03: সাতটি ধ্রুবের নির্দিষ্ট করে দেওয়া মান

ধ্রুব	মান
আলোর বেগ (c)	299,792,458 meter/second
প্ল্যাঙ্কের ধ্রুব (h)	$6.626\ 070\ 15 \times 10^{-34}$ Joule second
ইলেকট্রনের চার্জ (e)	$1.602176634 \times 10^{-19}$ coulomb
Cs^{133} পরমাণুর স্পন্দন ($\Delta\nu$) কম্পাঙ্ক	9,192,631,770 hertz
বোল্টজম্যান ধ্রুব (k)	1.380649×10^{-23} joule/kelvin
এভোগাড্রোর ধ্রুব (N_A)	$6.02214076 \times 10^{23}$ particles/mole
বিকিরণ তীব্রতা (K_{cd})	683 lumens/watt

সেকেন্ড (s): সিজিয়াম 133 (Cs^{133}) পরমাণুর 9,192,631,770 টি স্পন্দন সম্পন্ন করতে যে পরিমাণ সময় নেয় সেটি হচ্ছে এক সেকেন্ড।

মিটার (m): শূন্য মাধ্যমে এক সেকেন্ডের 299,792,458 ভাগের এক ভাগ সময়ে আলো যে দূরত্ব অতিক্রম করে সেটি হচ্ছে এক মিটার।

কিলোগ্রাম (kg): প্লাঙ্কের ধ্রুবকে $6.626\ 070\ 15 \times 10^{-34}$ m^2/s দিয়ে ভাগ দিলে যে ভর পাওয়া যায় সেটি হচ্ছে এক কিলোগ্রাম।

অ্যাম্পিয়ার (A): প্রতি সেকেন্ডে $1/(1.602176634 \times 10^{-19})$ সংখ্যক ইলেকট্রনের সমপরিমাণ চার্জ প্রবাহিত হলে সেটি হচ্ছে এক অ্যাম্পিয়ার।

মোল (Mol): যে পরিমাণ বস্তুতে এভোগাড্রোর ধ্রুব $6.02214076 \times 10^{23}$ সংখ্যক কণা থাকে সেটি হচ্ছে এক মোল।

কেলভিন (K): যে পরিমাণ তাপমাত্রার পরিবর্তনে তাপশক্তির 1.380649×10^{-23} joule পরিবর্তন হয় সেটি হচ্ছে কেলভিন।

ক্যান্ডেলা (cd): সেকেন্ডে 540×10^{12} বার কম্পনরত আলোর উৎস থেকে যদি এক স্টেরেডিয়ান (Steradian) ঘনকোণে এক ওয়াটের 683 ভাগের এক ভাগ বিকিরণ তীব্রতা পৌঁছায়, তাহলে সেই আলোর তীব্রতা হচ্ছে এক ক্যান্ডেলা।

টেবিল 1.04: নতুন SI একক

এক মিটার বলতে কতটুকু দূরত্ব বোঝায় বা এক কেজি ঠিক কতখানি ভর, কিংবা এক সেকেন্ড কতটুকু সময়, এক ডিগ্রি কেলভিন তাপমাত্রা কতটুকু উত্তাপ কিংবা এক অ্যাম্পিয়ার কতখানি কারেন্ট অথবা এক মোল পদার্থ বলতে কী বোঝায় বা এক ক্যান্ডেলা কতখানি আলো সেটা সম্পর্কে তোমাদের সবারই একটা বাস্তব ধারণা থাকা

উচিত! এই বেলা তোমাদের সেই বাস্তব ধারণাটা দেওয়ার চেষ্টা করে দেখা যাক। তোমাদের শুধু জানলে হবে না, খানিকটা কিন্তু অনুভবও করতে হবে। সাধারণভাবে বলা যায়:

- স্বাভাবিক উচ্চতার একজন মানুষের মাটি থেকে পেট পর্যন্ত দূরত্বটা মোটামুটি এক মিটার।
- এক লিটার পানির বোতলে কিংবা চার গ্লাসে যেটুকু পানি থাকে তার ভর হচ্ছে এক কেজির কাছাকাছি।
- 'এক হাজার এক' এই তিনটি শব্দ বলতে যেটুকু সময় লাগে সেটা মোটামুটি এক সেকেন্ড!
- বলা যেতে পারে তিনটা মোবাইল ফোন একসাথে চার্জ করা হলে এক অ্যাম্পিয়ার বিদ্যুৎ ব্যবহার করা হয়। (মোবাইল ফোন 5 ভোল্টের কাছাকাছি বিভব পার্থক্যে চার্জ করা হয়। তাই এখানে খরচ হবে 5 ওয়াট। যদি বাসার বাতি, পাখা, ফ্রিজে 220 ভোল্টের কিছুতে এক অ্যাম্পিয়ার বিদ্যুৎ ব্যবহার হয়, তখন কিন্তু খরচ হবে 220 ওয়াট!)
- হাত দিয়ে আমরা যদি কারো জ্বর অনুভব করতে পারি, বলা যেতে পারে তার তাপমাত্রা স্বাভাবিকের তুলনায় এক কেলভিন বেড়েছে।
- মোলটা অনুভব করা একটু কঠিন, বলা যেতে পারে একটা বড় চামচের এক চামচ পানিতে মোটামুটি এক মোল পানির অণু থাকে। এক কাপ পানিতে প্রায় দশ মোল পানি থাকে।
- একটা মোমবাতির আলোকে মোটামুটিভাবে এক ক্যান্ডেলা বলা যায়।

দেখতেই পাচ্ছ এর কোনোটাই নিখুঁত পরিমাপ নয় কিন্তু অনুভব করার জন্য সহজ। যদি এই পরিমাপ নিয়ে অভ্যস্ত হয়ে যাও, তাহলে ভবিষ্যতে যখন কোনো একটা হিসাব করবে, তখন সেটা নিয়ে তোমাদের একটা মাত্রাজ্ঞান থাকবে!

১.৫.২ উপসর্গ বা গুণিতক (Prefix)

বিজ্ঞান বা পদার্থবিজ্ঞান চর্চা করার জন্য আমাদের নানা কিছু পরিমাপ করতে হয়। কখনো আমাদের হয়তো গ্যালাক্সির দৈর্ঘ্য মাপতে হয় (6×10^{24} m) আবার কখনো একটা নিউক্লিয়াসের ব্যাসার্ধ মাপতে হয় (1×10^{-15} m); দূরত্বের মাঝে এই বিশাল পার্থক্য মাপার জন্য সব সময়েই একই ধরনের সংখ্যা ব্যবহার করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়, তাই আন্তর্জাতিকভাবে কিছু SI উপসর্গ বা গুণিতক (Prefix) তৈরি করে নেওয়া হয়েছে। এই গুণিতক থাকার কারণে একটা ছোট উপসর্গ লিখে অনেক বড় কিংবা অনেক

ছোট সংখ্যা বোঝাতে পারব। উপসর্গগুলো টেবিল ১.০৫ এ দেখানো হয়েছে। আমরা দৈনন্দিন জীবনে কিন্তু এগুলো সব সময় ব্যবহার করি। দূরত্ব বোঝানোর জন্য এক হাজার মিটার না বলে এক কিলোমিটার বলি। পানির আয়তন বোঝানোর জন্য এক লিটারের এক শতাংশ না বলে 10 মিলিমিটার বলি

টেবিল ১.০৫: SI ইউনিটে ব্যবহৃত গুণিতক বা উপসর্গ

ডেকা	da	10^{1}	ডেসি	d	10^{-1}
হেক্টো	h	10^{2}	সেন্টি	c	10^{-2}
কিলো	k	10^{3}	মিলি	m	10^{-3}
মেগা	M	10^{6}	মাইক্রো	μ	10^{-6}
গিগা	G	10^{9}	ন্যানো	n	10^{-9}
টেরা	T	10^{12}	পিকো	p	10^{-12}
পেটা	P	10^{15}	ফেমটো	f	10^{-15}
এক্সা	E	10^{18}	এটো	a	10^{-18}

১.৫.৩ মাত্রা (Dimension)

আমরা জেনে গেছি যে আমাদের চারপাশে অসংখ্য রাশি থাকলেও মাত্র সাতটি একক দিয়ে এই রাশিগুলোকে পরিমাপ করা যায়। একটা রাশি কোন একক দিয়ে প্রকাশ করা যায়, সেটি আমাদের জানতেই হয়। প্রায়ই রাশিটি কোন কোন মৌলিক রাশি (দৈর্ঘ্য L, সময় T, ভর M ইত্যাদি) দিয়ে কীভাবে তৈরি হয়েছে, সেটাও জানা থাকতে হয়। একটা রাশিতে বিভিন্ন মৌলিক রাশি যে সূচকে (পাওয়ারে) আছে, সেটাকে তার মাত্রা বলে। যেমন আমরা পরে দেখব বল হচ্ছে ভর এবং ত্বরণের গুণফল। ত্বরণ আবার সময়ের সাথে বেগের পরিবর্তনের হার। বেগ আবার সময়ের সাথে অবস্থানের পরিবর্তনের হার। কাজেই

বেগের মাত্রা: $\left[\frac{\text{দূরত্ব}}{\text{সময়}}\right] = \frac{L}{T} = LT^{-1}$

ত্বরণের মাত্রা: $\left[\frac{\text{দূরত্ব}}{\text{সময়}^2}\right] = \frac{L}{T^2} = LT^{-2}$

আমরা এই বইয়ে যখনই নতুন একটি রাশিমালার কথা বলব, সাথে সাথেই তার মাত্রাটির কথা বলে দেওয়ার চেষ্টা করব। দেখবে সেটা সব সময় রাশিটিকে বুঝতে অন্যভাবে সাহায্য করবে। এই বইয়ে

একটা রাশির মাত্রা বোঝাতে হলে সেটিকে তৃতীয় বন্ধনী বা স্কোয়্যার ব্র্যাকেটের (square bracket) ভেতর রেখে দেখানো হবে। যেরকম বল F হলে, $[F] = MLT^{-2}$

১.৫.৪ বৈজ্ঞানিক প্রতীক ও সংকেত (Scientific Symbols and Notations)

এককের সংকেত লেখার জন্য নিচের পদ্ধতিগুলো অনুসরণ করা হয়ে থাকে:

1. কোনো রাশির মান প্রকাশ করার জন্য একটি সংখ্যা লিখে তারপর একটি ফাঁকা জায়গা (Space) রেখে এককের সংকেতটি লিখতে হয়। যেমন $2.21\ \mathrm{kg}$, $7.3 \times 10^2\ \mathrm{m^2}$ কিংবা $22\ \mathrm{K}$, শতকরা চিহ্নও (%) এই নিয়ম মেনে চলে। তবে ডিগ্রি (°) মিনিট (′) এবং সেকেন্ড (″) লেখার সময় সংখ্যার পর কোনো ফাঁকা জায়গা বা space রাখতে হয় না।

2. গুণ করে পাওয়া লব্ধ একক লেখার সময় দুটি এককের মাঝখানে একটি ফাঁকা জায়গা বা Space দিতে হয়। যেমন: $2.35\ \mathrm{N\ m}$

3. ভাগ করে পাওয়া লব্ধ এককের বেলায় ঋণাত্মক সূচক বা Slash (যেমন $\mathrm{ms^{-1}}$ কিংবা m/s) দিয়ে প্রকাশ করা হয়।

4. প্রতীকগুলো যেহেতু গাণিতিক প্রকাশ, কোনো কিছুর সংক্ষিপ্ত রূপ নয়, তাই তাদের সাথে কোনো যতিচিহ্ন (.) বা Period ব্যবহৃত হয় না।

5. এককের সংকেত লেখা হয় সোজা অক্ষরে। যেমন–মিটারের জন্য m, সেকেন্ডের জন্য s ইত্যাদি। তবে রাশির সংকেত লেখা হয় italic বা বাঁকা অক্ষরে। যেমন– ভরের জন্য m, বেগের জন্য v ইত্যাদি।

6. এককের সংকেত ছোট হাতের অক্ষরে লেখা হয়। যেমন– cm, s, mol ইত্যাদি। তবে যেগুলো কোনো বিজ্ঞানীর নাম থেকে নেওয়া হয়েছে, সেখানে বড় হাতের অক্ষর (নিউটনের নাম অনুসারে N) হবে। একাধিক অক্ষর হলে শুধু প্রথমটি বড় হাতের অক্ষর হবে (প্যাস্কেলের নামানুসারে গৃহীত একক Pa)।

7. এককের উপসর্গ (k, G, M) এককের (m, W, Hz) সাথে কোনো ফাঁক ছাড়া যুক্ত হবে। যেমন– km, GW, MHz.

8. কিলো (10^3) থেকে সব বড় উপসর্গ বড় হাতের অক্ষর হবে (M, G, T)।

9. এককের সংকেতগুলো কখনো বহুবচন হবে না (25 kgs নয়, সব সময় 25 kg)।

10. কোনো সংখ্যা বা যৌগিক একক এক লাইনে লেখার চেষ্টা করতে হবে। খুব প্রয়োজন হলে সংখ্যা এবং এককের মাঝখানে line break দেওয়া যেতে পারে।

১.৬ পরিমাপের যন্ত্রপাতি (Measuring Instruments)

একসময় পদার্থবিজ্ঞানের বিভিন্ন রাশি সূক্ষ্মভাবে মাপা খুব কষ্টসাধ্য ব্যাপার ছিল। আধুনিক ইলেকট্রনিকস নির্ভর যন্ত্রপাতির কারণে এখন কাজটি অনেক ক্ষেত্রে খুব সোজা হয়ে গেছে। আমরা এই বইয়ে যে পরিমাণ পদার্থবিজ্ঞান শেখার চেষ্টা করব তার জন্য দূরত্ব, ভর, সময়, তাপমাত্রা, বিদ্যুৎ প্রবাহ এবং ভোল্টেজ মাপলেই মোটামুটি কাজ চালিয়ে নিতে পারব। এগুলো মাপার জন্য আমরা যে ধরনের যন্ত্রপাতি ব্যবহার করি সেগুলো সংক্ষেপে আলোচনা করা যাক:

১.৬.১ স্কেল (Scale) বা রুলার (Ruler)

ছোটখাটো দৈর্ঘ্য মাপার জন্য মিটার স্কেল ব্যবহার করা হয়। তোমরা সবাই নিশ্চয়ই মিটার স্কেল দেখেছ। 100 cm (সেন্টিমিটার) বা 1 m লম্বা বলে এটাকে মিটার স্কেল বলে। যেহেতু এখনো অনেক জায়গায় ইঞ্চি-ফুট প্রচলিত আছে (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একটি উদাহরণ দেশ!) সেহেতু মিটার স্কেলের অন্যপাশে প্রায় সব সময় ইঞ্চিতেও দাগ কাটা থাকে। এক ইঞ্চি 2.54 cm এর সমান।

একটা স্কেলে সবচেয়ে যে সূক্ষ্ম দাগ থাকে আমরা সে পর্যন্ত মাপতে পারি। মিটার স্কেল সাধারণত মিলিমিটার পর্যন্ত ভাগ করা থাকে, তাই সেই স্কেল ব্যবহার করে আমরা কোনো কিছুর দৈর্ঘ্য মিলিমিটার পর্যন্ত মাপতে পারি। অর্থাৎ আমরা যদি বলি কোনো কিছুর দৈর্ঘ্য 0.364 m তার অর্থ দৈর্ঘ্যটি হচ্ছে 36 সেন্টিমিটার এবং 4 মিলিমিটার। একটা মিটার স্কেল ব্যবহার করে এর চেয়ে সূক্ষ্মভাবে দৈর্ঘ্য মাপা সম্ভব নয়—অর্থাৎ সাধারণ মিটার স্কেলে আমরা কখনোই বলতে পারব না একটা বস্তুর দৈর্ঘ্য 0.3643 m। কিন্তু মাঝে মাঝেই কোনো একটা অত্যন্ত সূক্ষ্ম কাজে আমাদের এ রকম সূক্ষ্মভাবে মাপা প্রয়োজন হয়; তখন ভার্নিয়ার (Vernier) স্কেল নামে একটা মজার স্কেল ব্যবহার করে সেটা করা যায়।

স্লাইড/ভার্নিয়ার ক্যালিপার্স (Slide Calipers/Vernier Calipers)

ধরা যাক কোনো বস্তুর দৈর্ঘ্য মিলিমিটার স্কেলের 4 এবং 5 দাগ দুটির মাঝামাঝি, অর্থাৎ বস্তুটির দৈর্ঘ্য 4 মিলিমিটার থেকে বেশি কিন্তু 5 মিলিমিটার থেকে কম। 4 মিলিমিটার থেকে কত ভগ্নাংশ বেশি সেটা বের করতে হলে ভার্নিয়ার স্কেল ব্যবহার করা যায়, এই স্কেলটা মূল স্কেলের পাশে এবং মূল স্কেলের সমান্তরালে লাগানো থাকে এবং সামনে-পেছনে সরানো যায় (চিত্র 1.05)। ছবির উদাহরণে দেখানো হয়েছে 9 মিলিমিটার দৈর্ঘ্যকে ভার্নিয়ার স্কেল দশ ভাগ করা হয়েছে। অর্থাৎ ভার্নিয়ার স্কেলের প্রত্যেকটা ভাগের দৈর্ঘ্য হচ্ছে $\frac{9}{10}$ mm, যেটা নাকি এক মিলিমিটার থেকে $\frac{1}{10}$ মিলিমিটার কম। যদি ভার্নিয়ার স্কেলের শুরুটা কোনো একটা মিলিমিটার দাগের সাথে মিলিয়ে রাখা হয় তাহলে তার পরের দাগটি মূল স্কেলের পরের দাগ থেকে $\frac{1}{10}$ মিলিমিটার বাঁয়ে সরে থাকবে, এর পরেরটি $\frac{2}{10}$ মিলিমিটার

বাঁয়ে সরে থাকবে, তার পরেরটি $\frac{3}{10}$ মিলিমিটার বাঁয়ে সরে থাকবে—অর্থাৎ কোনোটাই মূল স্কেলের মিলিমিটার দাগের সাথে মিলবে না, একেবারে দশ নম্বর দাগটি আবার মূল স্কেলের নয় নম্বর মিলিমিটার দাগের সাথে মিলবে।

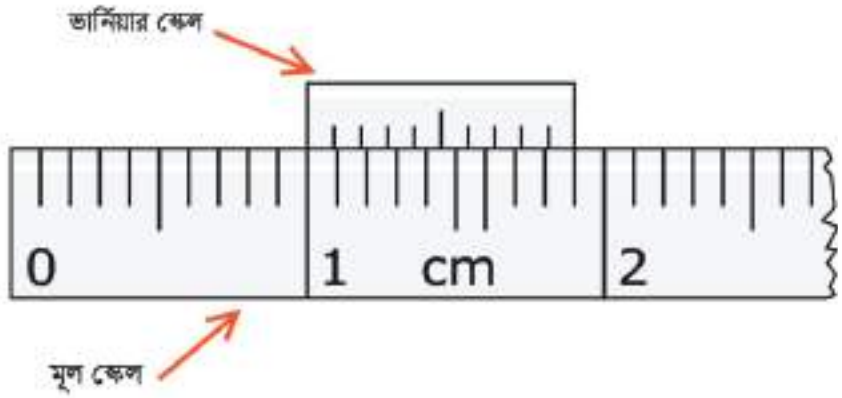

চিত্র ১.০৬ : মূল স্কেল এবং ভার্নিয়ার স্কেল, যেটি নাড়ানো সম্ভব।

বুঝতেই পারছ ভার্নিয়ার স্কেলটা যদি আমরা এমনভাবে রাখি যে শুরুটা একটা মিলিমিটার দাগ থেকে শুরু না হয়ে একটু সরে (যেমন $\frac{3}{10}$mm) শুরু হয়েছে (চিত্র 1.06) তাহলে ঠিক যত সংখ্যক $\frac{1}{10}$mm সরে শুরু হয়েছে ভার্নিয়ার স্কেলের তত নম্বর দাগটি মূল স্কেলের মিলিমিটার দাগের সাথে মিলে যাবে! কাজেই ভার্নিয়ার স্কেল ব্যবহার করে দৈর্ঘ্য মাপা খুব সহজ। প্রথমে জেনে নিতে হয় ভার্নিয়ার স্কেলের একটি ভাগ এবং মূল স্কেলের একটি ভাগের মাঝে পার্থক্য কতটুকু—এটাকে বলে ভার্নিয়ার ধ্রুবক (Vernier Constant সংক্ষেপে VC)। মূল স্কেলের সবচেয়ে ছোট ভাগের (1 mm) দূরত্বকে ভার্নিয়ার স্কেলের ভাগের (1.05 এবং 1.06 চিত্রে যা 10) সংখ্যা দিয়ে ভাগ দিলেই এটা বের হয়ে যাবে। আমরা যে উদাহরণ নিয়েছি সেখানে এটার মান:

$$VC = \frac{1\,\text{mm}}{10} = 0.1\,\text{mm} = 0.0001\,\text{m}$$

কোনো দৈর্ঘ্য মাপার সময় মিলিমিটারের সর্বশেষ দাগ পর্যন্ত মেপে ভার্নিয়ার স্কেলের দিকে তাকাতে হয়। ভার্নিয়ার স্কেলের কোন দাগটি মূল স্কেলের মিলিমিটার দাগের সাথে হুবহু মিলে গেছে বা সমপাতন হয়েছে সেটি বের করে সেই দাগ সংখ্যাকে ভার্নিয়ার ধ্রুবক দিয়ে গুণ দিতে হয়। মূল স্কেলে মাপা দৈর্ঘ্যের সাথে সেটি যোগ দিলেই আমরা প্রকৃত দৈর্ঘ্য পেয়ে যাব। চিত্র 1.06 এর শেষ স্কেলে যে দৈর্ঘ্য দেখানো হয়েছে আমাদের এই নিয়মে সেটি হবে 1.03 cm বা 0.0103 m।

২০২৩ মূল স্কেল এবং ভার্নিয়ার স্কেল সংবলিত এই যন্ত্রটির নাম স্লাইড ক্যালিপার্স বা ভার্নিয়ার ক্যালিপার্স।

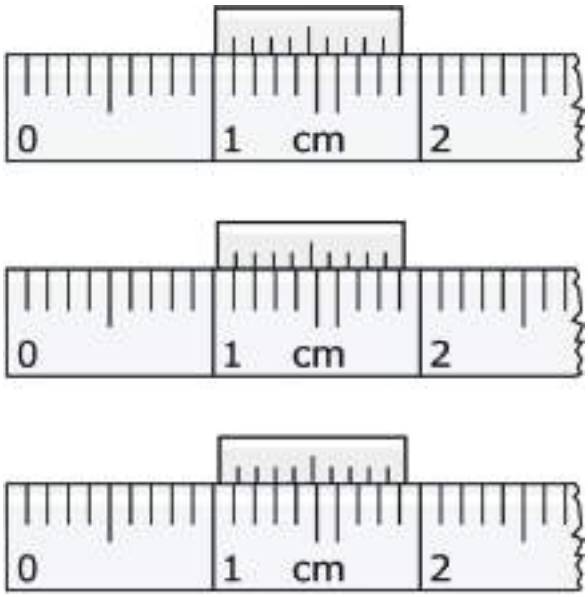

চিত্র ১.০৭: এক, দুই এবং তিন ঘর সরে যাওয়া ভার্নিয়ার স্কেল।

স্ক্রু-গেইজ (Screw Gauge)

ভার্নিয়ার স্কেলের পরিবর্তে একটা স্ক্রুকে ঘুরিয়ে (চিত্র ১.০৮) স্কেলকে সামনে-পেছনে নিয়েও স্ক্রু-গেইজ (Screw Gauge) নামে বিশেষ একধরনের স্কেলে দৈর্ঘ্য মাপা হয়। এখানে স্ক্রুর ঘাট (thread) অত্যন্ত সূক্ষ্ম রাখা হয় এবং পুরো একবার ঘোরানোর পর স্কেল লাগানো স্ক্রুটি হয়তো 1 mm অগ্রসর হয়। স্ক্রুর এই সরণকে স্ক্রুর পিচ (pitch) বলে। যে বৃত্তাকার অংশটি ঘুরিয়ে স্কেলটিকে সামনে-পেছনে নেওয়া হয় সেটিকে সমান 100 ভাগে ভাগ করা হলে প্রতি এক ঘর ঘূর্ণনের জন্য স্কেলটি পিচের $\frac{1}{100}$ ভাগের এক ভাগ অগ্রসর হয়। অর্থাৎ এই স্কেলে $\frac{1}{100}$ mm $= 0.01$ mm পর্যন্ত মাপা সম্ভব হতে পারে। এটাকে স্ক্রু গেইজের ন্যূনাঙ্ক বলে।

চিত্র১.০৮: চিত্রটিতে ভার্নিয়ার স্কেলযুক্ত স্লাইড ক্যালিপার্স এবং একটি স্ক্রুগেইজ দেখানো হলো।

আজকাল ভার্নিয়ার স্কেলের পরিবর্তে ডায়াল লাগানো কিংবা ডিজিটাল স্লাইড ক্যালিপার্স বের হয়েছে, যা দিয়ে সরাসরি সূক্ষ্মভাবে দৈর্ঘ্য মাপা যায়!

১.৬.২ ব্যালান্স (ভর মাপার যন্ত্র)

ভর সরাসরি মাপা যায় না, তাই সাধারণত ওজন মেপে সেখান থেকে ভরটি বের করা হয়। আমরা যখন বলি কোনো একটা বস্তুর ওজন 1 gm বা 1 kg তখন আসলে বোঝাই বস্তুটির ভর 1 gm কিংবা 1 kg, ওজন নয়। এক সময় বস্তুর ভর মাপার জন্য নিক্তি ব্যবহার করা হতো, যেখানে বাটখারার নির্দিষ্ট ভরের সাথে বস্তুর ভরকে তুলনা করা হতো। আজকাল ইলেকট্রনিক ব্যালেন্সের (চিত্র ১.০৮) ব্যবহার অনেক বেড়ে গেছে। ব্যালেন্সের ওপর নির্দিষ্ট বস্তু রাখা হলেই ব্যালেন্সের সেন্সর সেখান থেকে নিখুঁতভাবে ভরটি বের করে দিতে পারে।

চিত্র ১.০৯ : ডিজিটাল ভর মাপার যন্ত্র।

চিত্র ১.১০ : থামা ঘড়ি বা স্টপ ওয়াচ।

১.৬.৩ থামা ঘড়ি (Stop Watch)

সময়কাল মাপার জন্য স্টপ ওয়াচ ব্যবহার করা হয় (চিত্র ১.১০)। একসময় নিখুঁত স্টপ ওয়াচ অনেক মূল্যবান সামগ্রী থাকলেও ইলেকট্রনিকসের অগ্রগতির কারণে খুব অল্প দামের মোবাইল টেলিফোনেও আজকাল অনেক সূক্ষ্ম স্টপ ওয়াচ পাওয়া যায়। স্টপ ওয়াচে যেকোনো একটি মুহূর্ত থেকে সময় মাপা শুরু করা হয় এবং নির্দিষ্ট সময় পার হওয়ার পর সময় মাপা বন্ধ করে কতখানি সময় অতিক্রান্ত হয়েছে, সেটি বের করে ফেলা যায়। মজার ব্যাপার হচ্ছে, স্টপ ওয়াচ যত সূক্ষ্মভাবে সময় মাপতে পারে আমরা হাত দিয়ে কখনোই তত সূক্ষ্ম সময়ে এটা শুরু করতে বা থামাতে পারি না।

নিজে করো

তোমাদের সবার কাছে স্লাইড ক্যালিপার্স থাকার সম্ভাবনা কম কিন্তু তোমরা ইচ্ছা করলে কাজ চালানোর মতো স্লাইড ক্যালিপার্স তৈরি করে নিতে পারবে। ১.১১ চিত্রটি ফটোকপি করে নাও। তারপর চিত্রটিতে দেখানো উপায়ে (1, 2, 3, ... ধাপগুলো করে) মূল স্কেলে এবং ভার্নিয়ার স্কেলের অংশটুকু কেটে নিয়ে যেভাবে দেখানো হয়েছে সেভাবে ভাঁজ করে জায়গামতো বসিয়ে নাও। এখন এটা দিয়ে তুমি নিখুঁতভাবে কোনো কিছুর দৈর্ঘ্য মাপতে পারবে। স্লাইড ক্যালিপার্সটি ইঞ্চিতে, কাজেই সেন্টিমিটারে দৈর্ঘ্য পেতে হলে 2.54 দিয়ে গুণ করে নিতে হবে।

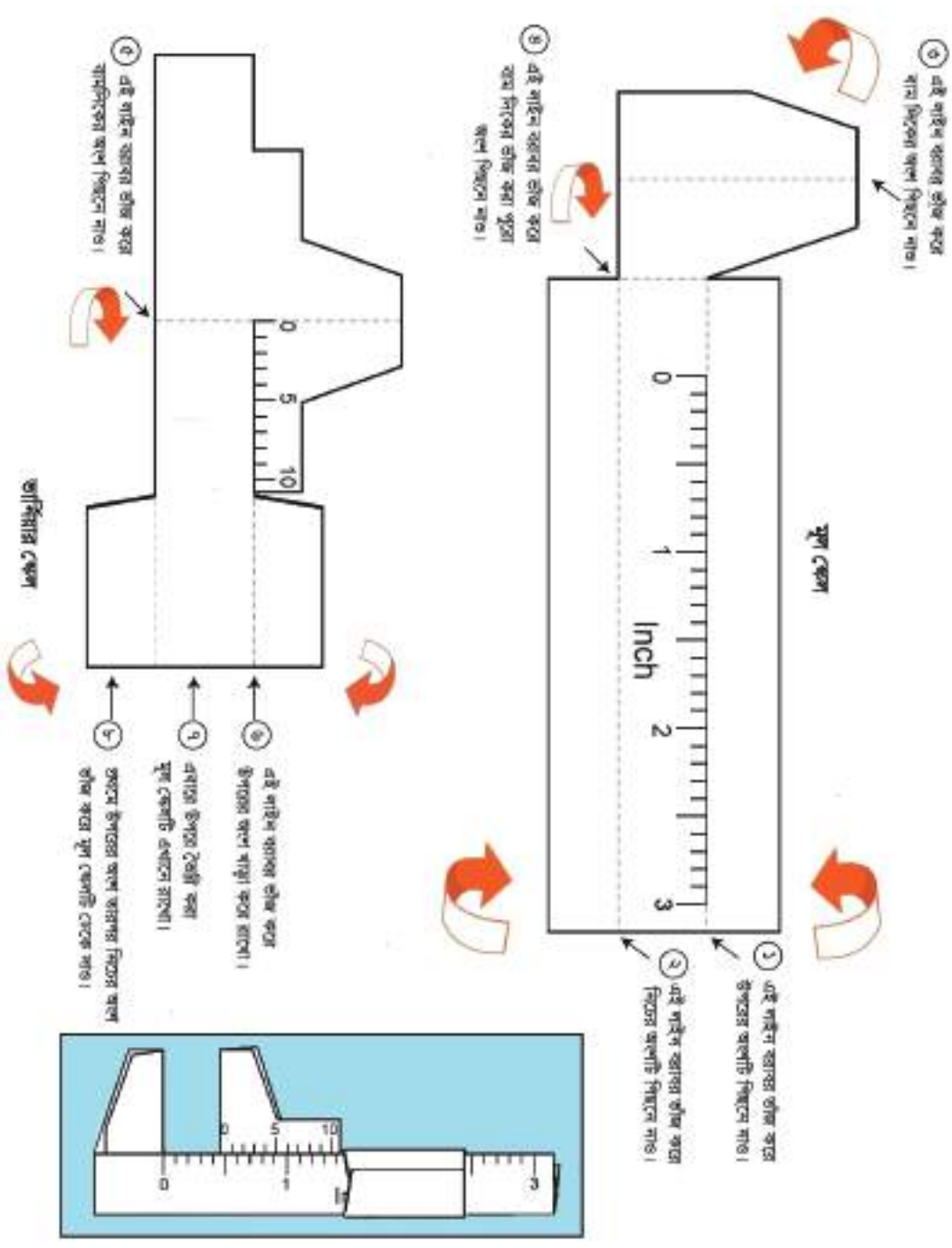

চিত্র ১.১১ : কাগজ দিয়ে স্লাইড ক্যালিপার্স তৈরি।

অনুসন্ধান ১.০১

উদ্দেশ্য: স্লাইড ক্যালিপার্স দিয়ে একটি ম্যাচ বাক্স বা অন্য কিছুর দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতা মেপে তার আয়তন বের করা। যদি তোমার কাছে স্লাইড ক্যালিপার্স না থাকে তা হলে ১.১১ চিত্রে দেখানো পদ্ধতিতে স্লাইড ক্যালিপার্স তৈরি করে নাও।

স্লাইড ক্যালিপার্সের সাহায্যে কোনো কিছুর দৈর্ঘ্য মাপতে হলে ছবিতে দেখানো উপায়ে সেটি স্লাইড ক্যালিপার্সের দুটি চোয়ালের মাঝখানে রাখতে হয়। চোয়াল দুটিকে বস্তুটির দুই পাশে স্পর্শ করতে হয়।

এবারে সাবধানে লক্ষ্য করো ভার্নিয়ারের শূন্য দাগ মূল স্কেলের কোন দাগ অতিক্রম করেছে, সেটি হবে প্রধান স্কেলের পাঠ M। লক্ষ্য করো, মূল স্কেলের কোন দাগের বেশি কাছে সেটি প্রধান স্কেলের পাঠ নয়, কোন দাগটি সম্পূর্ণ অতিক্রম করেছে সেটি মূল স্কেলের পাঠ M।

এই অবস্থায় ভার্নিয়ার স্কেলের কোন দাগটি মূল স্কেলের যেকোনো একটি দাগের সাথে মিলে যায়, সেটি নির্ণয় করো—এটি হচ্ছে ভার্নিয়ার সমপাতন V। একাধিকবার বস্তুটির দৈর্ঘ্য মাপো। ছকে বসাও। একইভাবে ম্যাচ বাক্সটির প্রস্থ এবং উচ্চতা মাপো।

পর্যবেক্ষণ: ভার্নিয়ার ধ্রুবক বের করা:

প্রধান স্কেলের ক্ষুদ্রতম এক ঘরের মান S = ...

ভার্নিয়ার স্কেলে মোট ভাগসংখ্যা n = ...

ভার্নিয়ার ধ্রুবক VC = S/n = ...

টেবিল 1.06: আয়তাকার বস্তুর দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতা নির্ণয়ের ছক:

বস্তুর	পর্যবেক্ষণ সংখ্যা	মূল স্কেল পাঠ M	ভার্নিয়ার সমপাতন V	ভার্নিয়ার ধ্রুবক VC	পাঠ M + (V × VC)	গড় পাঠ
দৈর্ঘ্য L						
প্রস্থ W						
উচ্চতা H						

১.৭ পরিমাপের ত্রুটি ও নির্ভুলতা (Error and accuracy of measurements)

ত্রুটি একটি নেতিবাচক শব্দ এবং 'পরিমাপে ত্রুটি' বলা হলে আমাদের মনে হয়, যে মানুষটি পরিমাপ করেছে সে তার দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন না করায় একটি ত্রুটি হয়েছে। বিষয়টি তা নয়। যে পরিমাপ করছে; তার অবহেলার কারণে কখনো কখনো ত্রুটি হতে পারে কিন্তু আমাদের জানতে হবে যে আমরা যে যন্ত্রপাতি দিয়ে পরিমাপ করি সেগুলো কখনো নির্ভুল নয়। কাজেই কতটুকু নির্ভুলভাবে পরিমাপ করা সম্ভব তার একটি সীমা আছে অর্থাৎ পরিমাপে ত্রুটি থাকা খুবই স্বাভাবিক। তবে পরিমাপ কতটুকু নির্ভুল হয়েছে তারও একটি পরিমাপ থাকতে হয়। কাজেই একটা পরীক্ষা করে পরীক্ষার ফলাফলটি জানানোর সময় সেটি কতটুকু নির্ভুল সেটাও জানিয়ে দিতে পারলে ফলাফলের বিশ্বাসযোগ্যতা অনেক বেড়ে যায়। পরীক্ষার ফলাফলের নির্ভুলতা বের করার জন্য কিছু প্রচলিত নিয়ম জানা থাকলে তোমরাও তোমাদের পরীক্ষার ফলাফলের নির্ভুলতার একটা পরিমাপ দিতে পারবে।

ধরা যাক, তুমি একটি স্কেল দিয়ে বস্তুর দৈর্ঘ্য মাপছ। বস্তুটির দৈর্ঘ্য কত নির্ভুলভাবে মাপতে পারবে সেটি নির্ভর করে তোমার স্কেলটিতে কত সূক্ষ্মভাবে দাগ কাটা হয়েছে তার ওপর। যদি প্রতি 1 cm পরপর দাগ কাটা থাকে, তাহলে উত্তরটি অবশ্যই তুমি নির্দিষ্ট সংখ্যক cm এ প্রকাশ করবে। কিন্তু বস্তুর প্রকৃত দৈর্ঘ্যটি যে হুবহু সেই সংখ্যক cm ছিল তা কিন্তু নয়, সেটি সম্ভবত এর কাছাকাছি ছিল, কাজেই তোমার মাপা দৈর্ঘ্যটির ভেতর একটু অনিশ্চয়তা থাকা সম্ভব, সে কারণে প্রচলিত নিয়মে আমরা প্রকৃত উত্তরের সাথে সেই অনিশ্চয়তাটুকু যোগ করে দিই। অর্থাৎ আমরা যদি দেখি দৈর্ঘ্যটি 4 এর কাছাকাছি, তাহলে আমরা বলব বস্তুটির দৈর্ঘ্য:

$$(4.0 \pm 0.5)\text{cm}$$

অর্থাৎ বস্তুটির দৈর্ঘ্য 3.5 cm থেকে 4.5 cm এর ভেতর যেকোনো মান হতে পারে।

উদাহরণ

প্রশ্ন :১.১২ চিত্রটিতে দেখানো বস্তুটির দৈর্ঘ্য কত?

উত্তর: বস্তুটির দৈর্ঘ্য 7 ± 0.5 mm অর্থাৎ বস্তুটির দৈর্ঘ্য 6.5 mm থেকে 7.5 mm এর ভেতরে যেকোনো মান হতে পারে।

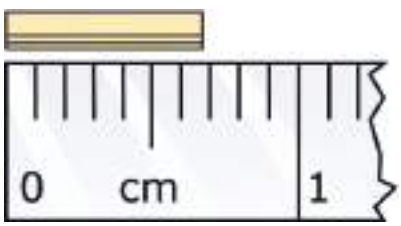

চিত্র১.১২ : স্কেলের পাশে বস্তুটির দৈর্ঘ্য 7 mm এর কাছাকাছি।

এবারে আমরা নির্ভুলতা কীভাবে পরিমাপ করা যায় সেটা নিয়ে আলোচনা করতে পারি। নির্ভুলতার একটা পরিমাপ হচ্ছে চূড়ান্ত ত্রুটি (absolute

error)। নামটি দেখেই বোঝা যাচ্ছে, এটি হচ্ছে প্রকৃত মানের তুলনায় পরিমাপ করা মাপের পার্থক্যটুকু। তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ আমরা যখন পরিমাপ করি, তখন প্রকৃত মানটি আসলে জানি না। তাই চূড়ান্ত ত্রুটি হিসেবে আমরা সবচেয়ে বেশি সম্ভাব্য ত্রুটিকেই ব্যবহার করি। অর্থাৎ আমাদের আগের উদাহরণে চূড়ান্ত ত্রুটি হচ্ছে

$$|\pm 0.5 \text{ mm}| = 0.5 \text{ mm}$$

চূড়ান্ত ত্রুটির পর আমরা Relative Error বা আপেক্ষিক ত্রুটির বিষয়টি দেখতে পারি। ধরা যাক কোনো দৈর্ঘ্য মাপতে গিয়ে আমাদের ± 0.5 mm ত্রুটি হয়। বস্তুটির দৈর্ঘ্য যদি 1 mm হয়, তাহলে এই ত্রুটিটি খুবই গুরুতর কিন্তু দৈর্ঘ্যটি যদি 1 m হয় তাহলে পরিমাপটি যথেষ্ট নির্ভুল। এই বিষয়টুকু বোঝানোর জন্য আপেক্ষিক ত্রুটি বা Relative Error–এর ধারণা আনা হয়েছে।

অর্থাৎ

আপেক্ষিক ত্রুটি = চূড়ান্ত ত্রুটি/পরিমাপ করা মান
কাজেই আমাদের আগের উদাহরণে:
আপেক্ষিক ত্রুটি হচ্ছে: $0.5 \text{ mm} / 7 \text{ mm} = 0.071$
শতাংশের হিসাবে এটি হচ্ছে $0.071 \times 100\% = 7.1\%$

প্রশ্ন: ধরা যাক, বর্গাকৃতি একটা বইয়ের দৈর্ঘ্য পরিমাপ করে তুমি 10 cm পেয়েছ। ধরা যাক, পরিমাপে 10% আপেক্ষিক ত্রুটি হয়েছে। বস্তুটির ক্ষেত্রফলে আপেক্ষিক ত্রুটি কত?

উত্তর: বস্তুটির পরিমাপ করা ক্ষেত্রফল $10 \times 10 = 100 \text{ cm}^2$

যেহেতু বস্তুটির আপেক্ষিক ত্রুটি 10% কাজেই তার দৈর্ঘ্য পরিমাপ করা হলে সবচেয়ে কম 9 cm এবং সবচেয়ে বেশি 11cm হতে পারে।

কাজেই ক্ষেত্রফল,

সবচেয়ে কম $9 \text{ cm} \times 9 \text{ cm} = 81 \text{ cm}^2$ এবং
সবচেয়ে বেশি $11 \text{ cm} \times 11 \text{ cm} = 121 \text{ cm}^2$ হতে পারে।

কাজেই চূড়ান্ত ত্রুটি:

$$|100 \text{ cm}^2 - 81 \text{ cm}^2| = 19 \text{ cm}^2$$

অথবা $|121 \text{ cm}^2 - 100 \text{ cm}^2| = 21 \text{ cm}^2$

যেহেতু দুটি সমান নয় আমরা বড়টি নিই অর্থাৎ চূড়ান্ত ত্রুটি 21 cm^2

কাজেই আপেক্ষিক ত্রুটি $21\ \text{cm}^2 / 100\ \text{cm}^2 = 0.21$
শতাংশের হিসাবে $0.21 \times 100\,\% = 21\%$

অর্থাৎ দৈর্ঘ্যের পরিমাপে 10% ত্রুটি হলে ক্ষেত্রফলের বেলায় সেটি হবে প্রায় দ্বিগুণ। একইভাবে তুমি দেখাতে পারবে আয়তন মাপা হলে তার ত্রুটি হবে তিন গুণ!

প্রশ্ন: তুমি একটি বাক্স এমন একটি রুলার দিয়ে মেপেছ, যেখানে শুধু cm দিয়ে দাগ। তুমি বাক্সটির দৈর্ঘ্য প্রস্থ এবং উচ্চতা হিসেবে পেয়েছ 10 cm, 5 cm, 4 cm, তোমার মাপে কত শতাংশ ত্রুটি আছে?

উত্তর: যেহেতু তোমার রুলারে শুধু cm দাগ দেওয়া, কাজেই তোমার ত্রুটি ± 0.5 cm কাজেই তোমার মাপের ত্রুটি:

দৈর্ঘ্য 10 ± 0.5 cm
প্রস্থ 5 ± 0.5 cm
উচ্চতা 4 ± 0.5 cm

তোমার মাপা আয়তন: $10\ \text{cm} \times 5\ \text{cm} \times 4\ \text{cm} = 200\ \text{cm}^3$

সম্ভাব্য সবচেয়ে ছোট আয়তন:

$$(10 - 0.5)\ \text{cm} \times (5 - 0.5)\ \text{cm} \times (4 - 0.5)\ \text{cm} = 149.625\ \text{cm}^3$$

সম্ভাব্য সবচেয়ে বড় আয়তন:

$$(10 + 0.5)\ \text{cm} \times (5 + 0.5)\ \text{cm} \times (4 + 0.5)\ \text{cm} = 259.875\ \text{cm}^3$$

কাজেই আয়তন $149.625\ \text{cm}^3 < V < 259.875\ \text{cm}^3$

চূড়ান্ত ত্রুটি:

$149.625\ \text{cm}^3$ থেকে $200\ \text{cm}^3$ হচ্ছে $200\ \text{cm}^3 - 149.625\ \text{cm}^3 = 50.375\ \text{cm}^3$
$200\ \text{cm}^3$ থেকে $259.875\ \text{cm}^3$ হচ্ছে $259.875\ \text{cm}^3 - 200\ \text{cm}^3 = 59.875\ \text{cm}^3$

আমরা বড়টি নিই: অর্থাৎ চূড়ান্ত ত্রুটি $59.875\ \text{cm}^3$

আপেক্ষিক ত্রুটি: $59.875\ \text{cm}^3 / 200\ \text{cm}^3 \times 100\,\% = 29.9375\% \cong 30\%$

নমুনা প্রশ্ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

সঠিক উত্তরটির পাশে টিক (√) চিহ্ন দাও:

১. কোয়ান্টাম তত্ত্ব প্রথম কে প্রদান করেন?

(ক) প্ল্যাঙ্ক

(খ) আইনস্টাইন

(গ) রাদারফোর্ড

(ঘ) হাইজেনবার্গ

২. বোজন কার নাম থেকে এসেছে?

(ক) জগদীশচন্দ্র বসু

(খ) সুভাষচন্দ্র বসু

(গ) সত্যেন্দ্রনাথ বসু

(ঘ) শরৎচন্দ্র বসু

৩. নিচের কোনটি মৌলিক রাশি নয়?

(ক) ভর

(খ) তাপ

(গ) তড়িৎ প্রবাহ

(ঘ) পদার্থের পরিমাণ

৪. একটি দণ্ডকে স্লাইড ক্যালিপার্সে স্থাপনের পর যে পাঠ পাওয়া গেল তা হচ্ছে প্রধান স্কেল পাঠ 4 cm, ভার্নিয়ার সমপাতন 7 এবং ভার্নিয়ার ধ্রুবক 0.1 mm, দণ্ডটির দৈর্ঘ্য কত?

(ক) 4.07 cm

(খ) 4.7 cm

(গ) 4.07 cm

(ঘ) 4.7 mm

নিচের তথ্য ও চিত্র থেকে ৫ এবং ৬ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:

রফিক স্কেল দিয়ে একটি পেন্সিলের দৈর্ঘ্য 15 cm পরিমাপ করল। [দৈর্ঘ্য মাপার চূড়ান্ত ত্রুটি 0.5 cm]

৫. রফিকের দৈর্ঘ্য পরিমাপের আপেক্ষিক ত্রুটি কত?

(ক) 15.5%

(খ) 14.5%

(গ) 3.44%

(ঘ) 3.33%

৬. ক ও খ চিত্রের আয়তনের অনুপাত:

(ক) 1 : 0.673

(খ) 1 : 0.0673

(গ) 1 : 0.763

(ঘ) 1 : 0.637

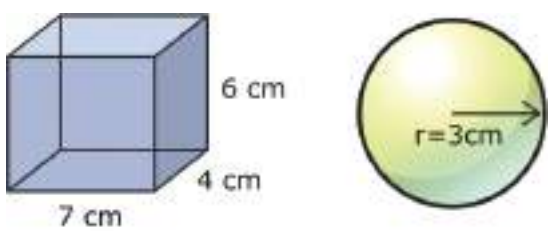

চিত্র ১.১৩ : একটি ব্লক এবং একটি গোলক।

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. রাশেদ তার সদ্য কেনা স্কেল দিয়ে পেনসিলের দৈর্ঘ্য মেপে বলল, পেনসিলটির দৈর্ঘ্য 11.73 cm। তার বন্ধু সুজন বলল এই পরিমাপ সঠিক না-ও হতে পারে। রাশেদ বলল যে এই স্কেল দিয়ে কয়েকবার পরিমাপ করে একই ফল পেয়েছে। তারা শিক্ষকের কাছে গেলে শিক্ষক তাদের 0.005 cm ভার্নিয়ার ধ্রুবকবিশিষ্ট ভার্নিয়ার স্কেল ব্যবহার করতে বললেন। রাশেদ ভার্নিয়ার স্কেলের সাহায্যে সঠিক দৈর্ঘ্য পরিমাপ করল। প্রধান স্কেলের ক্ষুদ্রতম এক ভাগের মান 1 mm ছিল।

(ক) ভার্নিয়ার ধ্রুবক কী?

(খ) কোনো রাশির পরিমাণ প্রকাশ করতে এককের প্রয়োজন হয় কেন?

(গ) ব্যবহৃত ভার্নিয়ার স্কেলের এক ভাগ প্রধান স্কেলের কত ভাগের সমান নির্ণয় করো।

(ঘ) রাশেদের প্রথম দৈর্ঘ্য পরিমাপ সঠিক পরিমাপের সাথে সংগতিপূর্ণ ছিল না যুক্তি সহকারে লেখো।

২. বিজ্ঞান শিক্ষক রশিদ সাহেব পদার্থবিজ্ঞান ক্লাসে ছাত্র-ছাত্রীদের একটি বাক্স এবং একটি রুলার দিয়ে বাক্সটির আয়তন নির্ণয় করতে বললেন। ছাত্র-ছাত্রীরা লক্ষ করল, রুলারে শুধু cm পর্যন্ত মাপা যায়। ছাত্র-ছাত্রীরা রুলার দিয়ে বাক্সটির দৈর্ঘ্য, প্রস্থ এবং উচ্চতা হিসেবে যথাক্রমে 20 cm, 15 cm এবং 10 cm পেল।

(ক) মাত্রা কী?

(খ) ওজন ও ভর কেন একই ধরনের রাশি নয়?

(গ) বাক্সটির আয়তন পরিমাপে আপেক্ষিক ত্রুটি কত শতাংশ নির্ণয় করো।

(ঘ) এই রুলারটি বইয়ের ক্ষেত্রফল মাপার জন্য ঠিক আছে, কিন্তু ঘরের ক্ষেত্রফল মাপার জন্য ঠিক নেই, উক্তিটি বিশ্লেষণ করো।

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. রাশি বলতে কী বোঝায়?

২. মৌলিক ও লব্ধ রাশির মধ্যে দুইটি পার্থক্য লিখ।

৩. স্লাইড ক্যালিপার্সে প্রধান স্কেলের সাথে ভার্নিয়ার স্কেল সংযুক্ত করা হয় কেন?

৪. ভার্নিয়ার ধ্রুবকের মান 0.1 mm বলতে কি বোঝায়?

দ্বিতীয় অধ্যায়

গতি

(Motion)

আমাদের চারপাশে অনেক ধরনের গতি রয়েছে। একজন যখন সাইকেল চালিয়ে যায়, সেটি একধরনের গতি, যখন একটি গাড়ি যায় সেটিও, একধরনের গতি। যখন প্লেন উড়ে যায় সেটিও গতি, পৃথিবী যখন সূর্যের চারদিকে ঘোরে সেটিও একটি গতি। ঝুলন্ত একটি বাতি যখন দুলতে থাকে, সেটিও গতি, রাইফেল থেকে যখন বুলেট বের হয় সেটিও গতি। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, এই নানা ধরনের গতি সব ভিন্ন ভিন্ন ধরনের গতি; কিন্তু তোমরা জেনে খুবই অবাক এবং খুশি হবে যে একেবারে অল্প কয়েকটি রাশি দিয়ে এই সবগুলোকে ব্যাখ্যা করা সম্ভব।

সেই রাশিগুলো, তাদের একক, মাত্রা এবং একের সাথে অন্যের কী সম্পর্ক এই অধ্যায়ে তা আলোচনা করা হবে।